স্বস্তিকা

দাম : দশ টাকা
৬৬ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা।।
৪ আগস্ট - ২০১৪।।
১৮ শ্রাবণ - ১৪২১।।
website : www.eswastika.com

রাখীবন্ধন ও জাতীয় সংহতি

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের শিল্প-ভাবনা

...পৃঃ ৩২

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

বাঙালি কি ভীরু বিবেকহীন জাতিতে পরিণত হচ্ছে? ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : তিন বছরেই শুদ্ধিকরণের ডাক লবিবাজি নিপাত যাক ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

BRICS সম্মেলনে মোদী : চীনের সঙ্গে জোট বাঁধা নয়, বরং রোখাটাই জরুরি ▯ এন সি দে ▯ ১২

রাজ্যে রাজ্যে রাখিবন্ধন ▯ নবকুমার ভট্টাচার্য ▯ ১৪

রাখিবন্ধন ও জাতীয় সংহতি ▯ অতুল কুমার বিশ্বাস ▯ ১৭

কেদার ভুড়ভুড়ির দেউল ▯ ড: প্রণব রায় ▯ ২১

বিলুপ্ত বিদ্যা যক্ষিণী সাধনা ▯ নবকুমার ভট্টাচার্য ▯ ২২

মানবপ্রেমিক শ্রীশ্রীঅন্নদাঠাকুর ▯ মধুসূদন মুখোপাধ্যায় ▯ ২৩

মোদী ও সচেতন পশ্চিম ▯ এম ভি কামাথ ▯ ২৭

সংস্কৃত, রাষ্ট্রীয় সংহতি ও আমরা ▯ ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার ▯ ২৯

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের শিল্পভাবনা ▯ রাজদীপ মিশ্র ▯ ৩২

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

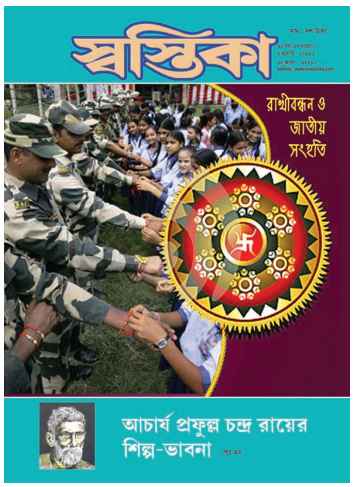

পৃ: ১৪-১৭

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ▯ **অঙ্গনা : ২৬** ▯ **সুস্বাস্থ্য : ৩৫** ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৭**▯ **রঙ্গম : ৩৯** ▯ **শব্দরূপ : ৪০** ▯ **চিত্রকথা : ৪১** ▯ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৬ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা, ১৮ শ্রাবণ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৬, ৪ আগস্ট - ২০১৪

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬

৮৬৯৭৫২১৪৭৯

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪,

৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

প্রকাশিত হবে ১১ই আগস্ট ২০১৪

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে ১১ই আগস্ট ২০১৪

অখণ্ড ভারত-ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা

অখণ্ড ভারত-ভাবনা একটা সাংস্কৃতিক ধারণা। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী, গান্ধার হতে ব্রহ্মদেশ— বিস্তৃত ভারতবর্ষে এক অখণ্ড একাত্ম চেতনা সুপ্রাচীনকাল থেকেই অন্তঃসলিলা নদীর মতো প্রবহমান। দেশভাগ সেই ভাবনায় আঘাত করেছে। তার দায় এখনও আমরা বহন করে চলেছি। আজকের 'সার্ক' এই দেশগুলিরই সমষ্টি। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে এই ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করেছেন **অধ্যাপক ভাস্কর পুরকায়স্থ ও অধ্যাপক মোহিত রায়।**

দাম একই থাকছে— দশ টাকা।।

HB®

INDIA'S NO. 1 IN ISI MARKED HEAVY PIPE FITTINGS

HB® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor

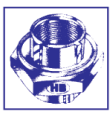

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES

54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833

3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803

Sister Concern

Partha Sarathi Ceramics

4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE® PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

সম্পাদকীয়

ভারত হিন্দুরাষ্ট্র

সম্প্রতি গোয়া বিধানসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অভিনন্দন জানিয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণের প্রাক্কালে রাজ্য সরকারের শরিক গোমন্তক দলের বিধায়ক তথা মন্ত্রী দীপক দাভালিকর বলিয়াছেন, ভারত প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে একটি শক্তিমান হিন্দুরাষ্ট্র হিসেবে গড়িয়া উঠিবে। বিধানসভায় কংগ্রেস সদস্যরা দাভলিকরের এই বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন, ইহা সংবিধান বিরোধী এবং সেইসঙ্গে ওয়াক আউটও করেন। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যাইতে পারে যে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদী ইতিপূর্বে এক সাক্ষাৎকারে জানাইয়াছিলেন যে তিনি হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাই তিনি হিন্দু এবং দেশকে ভালোবাসেন, তাই জাতীয়তাবাদী। তিনি হিন্দু জাতীয়তাবাদী।

আমাদের দেশের পক্ষে ইহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে ইতিহাস স্বীকৃত হাজার বৎসর ধরিয়া প্রবহবান জাতীয়তাবাদকে রাজনৈতিক অভিসন্ধির জন্য বলি দেওয়া হইয়াছে। ধূর্ত ইংরাজদের ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দিয়া জাতীয়তাবাদে হিন্দুত্বের ভিত্তিভূমিকে আমরা অস্বীকার করিয়াছি, 'ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের' তোষণে সত্য কথা বলিতে পশ্চাৎপদ হইয়াছি। চীন যেমন চীনাদের, জাপান জাপানীদের, ইংল্যান্ড ইংরেজদের, ফ্রান্স ফরাসীদের, জার্মান জার্মানীদের, ঠিক তেমন হিন্দুস্থান হিন্দুদেরই। কিন্তু নেহরুর কংগ্রেস ও তাঁহার বশংবদরা, কম্যুনিস্ট, সোস্যালিস্ট ও মেকি-ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বুদ্ধিজীবীর দল নিজেদের আপন সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থ ও রাষ্ট্র ক্ষমতাকে নিজেদের করায়ত্ত রাখিবার জন্য এই সত্যটিকে চাপা দিতে নিরন্তর চেষ্টা করিয়া চলিতেছে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে 'হিন্দু' শব্দকে সাম্প্রদায়িকতার প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করিয়া ইহার প্রকৃত অর্থকে বিকৃত করা হইতেছে। হিন্দুরাষ্ট্রকে ধর্মীয় রাষ্ট্র (Theocratic State) হিসাবে অপব্যাখ্যা করা হইতেছে। যদিও দুইটি শব্দ সম্পূর্ণ আলাদা। নেশন এবং স্টেট-এর প্রতিশব্দ যথাক্রমে রাষ্ট্র ও রাজ্য। দুইটি শব্দকে সমার্থক করিয়া 'হিন্দুরাষ্ট্র'-এর ধারণাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপিত করা হইতেছে। এই প্রয়াসের অর্থ স্বামী বিবেকানন্দ, মহাযোগী অরবিন্দ, লোকমান্য তিলক প্রমুখ মনীষীকে অপমান করা। কারণ তাঁহারা প্রত্যেকেই সুস্পষ্ট ভাষায় হিন্দুরাষ্ট্রের কথা বলিয়া গিয়াছেন। ইহা হইবে সেই মহাত্মা গান্ধীরও অপমান, যিনি উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, 'প্রতিনিয়ত সত্যানুসন্ধানের অপর নাম হইল হিন্দুত্ব।' বিবিধতার মধ্যে একতা, বিরোধ নয় সমন্বয় এবং সর্বমতের প্রতি সমান শ্রদ্ধাপোষণ— এই সকল তত্ত্বের উপর নির্ভর করেই এই পৃথিবীতে হিন্দুরাষ্ট্রজীবন গড়িয়া উঠিয়াছে। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে সুপ্রিম কোর্টও হিন্দুত্বকে 'এ ওয়ে অফ লাইফ' বলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের উক্তিটি স্মরণযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন— ''হিন্দু শব্দে এবং মুসলমান শব্দে একই পর্যায়ের পরিচয়কে বুঝায় না। মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম কিন্তু হিন্দু কোনো বিশেষ ধর্ম নহে। হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম।'' বস্তুত 'মত পরিবর্তন হইলে জাতির পরিবর্তন হয় না', কেননা 'জাতি জিনিসটা মতের চেয়ে অনেক বড়ো।'

গোয়ার উপ-মুখ্যমন্ত্রী ফ্রান্সিস ডি সুজা সম্প্রতি এই মর্মেই নিজের বক্তব্য সুস্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন। মন্ত্রিসভার সহকর্মীর বক্তব্যের সমর্থনে তিনি বলিয়াছেন, শ্রীদাভালিকরের বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হইতেছে। কেননা ভারত হিন্দুদের দেশ, এই দেশের নাম হিন্দুস্থান। সকল ভারতীয় অবশ্যই হিন্দু। তাঁহাদের মধ্যে খৃস্টধর্মাবলম্বী তিনি নিজেও আছেন। তিনি একজন খৃস্টান-হিন্দু কিন্তু হিন্দুস্থানী। ভারত হিন্দুরাষ্ট্র ছিল, আছে ও থাকবে। তাই ভারতকে আর নতুন করিয়া হিন্দুরাষ্ট্র নির্মাণের প্রসঙ্গ অর্থহীন। ডি সুজার বক্তব্য সর্বাংশে সত্য; সুতরাং সমর্থনযোগ্য।

সুভাষিত

হিমালয়ং সমারভ্য যাবদিন্দু সরোবরম্।

তং দেবনির্মিতং দেশং হিন্দুস্থানং প্রচক্ষতে।। —বার্হস্পত্য শাস্ত্রম্

হিমালয় থেকে ভারতমহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ঈশ্বরনির্মিত দেশকে হিন্দুস্থান বলা হয়।

জাতি নির্ভরযোগ্য নেতৃত্বের হাতেই রয়েছে—জে. বিক্রম সিং

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কার্গিল যুদ্ধের বীর শহীদদের ১৫তম স্মরণসভায় গিয়ে সৈনাধ্যক্ষ জেনারেল বিক্রম সিং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানালেন, বর্তমানে দেশের নিরাপত্তা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত, কেননা তা যোগ্যতম নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। অবসর নেবার মাত্র কয়েকদিন আগেই কার্গিল শহীদ স্মারক উন্মোচন করতে কার্গিলের কাছেই টোলোলিং পাহাড়ের যে পাদদেশ থেকে ভারতীয় সেনা সর্বপ্রথম অনুপ্রবেশকারী পাকসেনাকে হটিয়ে দেয় সেখানেই জাতির উদ্দেশে সেনাধ্যক্ষ এই আশ্বাসবাণীটি উচ্চারণ করেন।

প্রসঙ্গত প্রতিরক্ষামন্ত্রী অরুণ জেটলি সেনাবাহিনীর তিন শাখার প্রধানদের নিয়ে গত ২৬ জুলাই 'কার্গিল বিজয় দিবস' উপলক্ষে 'অপারেশন বিজয়'-এর নিহত সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

সংবাদসূত্র অনুযায়ী স্থলবাহিনীর প্রধান জেনারেল সিং দেশবাসীর উদ্দেশে বলেন, আমাদের সেনারা সীমান্তে অতন্দ্র প্রহরায় রত। দেশের সার্বভৌমত্ব ও সীমান্ত সুরক্ষার ক্ষেত্রে তারা পূর্ণ সক্ষম। ''Your Army is fully geared to take on the challenges''।

জেনারেল সিং তাঁর আসন্ন অবসর লগ্নের প্রেক্ষিতে কারগিল পরিদর্শনকে 'গুডবাই ভিজিট' বলে আখ্যা দিয়ে বলেন, তাঁর পেশাকে শেষ বিদায় জানানোর পক্ষে কার্গিলে এসে নিহত শহীদদের স্মৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের চেয়ে বেশি উপযুক্ত আর কিছুই হতে পারে না। এ যুদ্ধের শহীদদের বীরাঙ্গনা পরিবারের (Veer Naris) সঙ্গে মিলিত হওয়ার এটিই শ্রেষ্ঠ সময়। তিনি নিজেকে গর্বিত বোধ করছেন। এই প্রসঙ্গে সেনাধ্যক্ষ জানান, বর্তমানে সেনাবাহিনীর জীবনযাত্রায় লক্ষণীয় উন্নতি ঘটেছে। আজ তারা নিজেদের নিরাপত্তা ও আত্মসম্মান নিয়ে নিশ্চিন্ত। এই মর্মে সরকারের ভূমিকাও প্রশংসনীয়। বাহিনীকে আশ্বস্ত করে জেনারেল সিং বলেন, ''বর্তমান সরকার সমগ্র সেনাবাহিনীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সম্পূর্ণ দায়বদ্ধ ও সহানুভূতিশীল।'' প্রসঙ্গত, এদিনের মুখ্য আকর্ষণ ছিলেন সুবেদার যোগেন্দ্র সিং যাদব ও নায়েক সুবেদার সঞ্জয় কুমার। এই দুই বীর সৈনিক পাকিস্তানি শত্রুবাহিনীর সঙ্গে মরণপণ যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসেন। সঞ্জয় কুমারের রোমহর্ষক বয়ান অনুযায়ী তিনি ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়েই যুদ্ধ করেছিলেন। সেই সময় পদাধিকার অনুযায়ী সঞ্জয় ছিলেন 'রাইফেল ম্যান'। তিনি প্রথমে টোলোলিং-এর ৫১৪০ পয়েন্ট লড়াই চালান ও পরে আরও ১০ জন সেনার সঙ্গে পয়েন্ট ৪৮৭৫ থেকে পাকিস্তানি সেনাদের হটিয়ে 'মুঝকোহ উপত্যকা' ভারতের দখলে আনেন। এই সম্মুখ সমরে মারাত্মকভাবে জখম হন সঞ্জয়। যোগেন্দ্র ও সঞ্জয় দু'জনকেই পরবর্তীকালে 'পরমবীর চক্র' প্রদান করা হয়।

ভারতবর্ষ আবহমানকাল থেকেই হিন্দুরাষ্ট্র—ডি সুজা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কয়েকদিন আগেই গোয়ার মন্ত্রী দীপক দাভালিকর মন্তব্য করেছিলেন— ভারত প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে একটি শক্তিমান হিন্দুরাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠবে— এই বক্তব্যে যে বিতর্কের সূত্রপাত হয় তাতে আরও একটি মাত্রা যোগ করলেন গোয়ার উপ-মুখ্যমন্ত্রী ফ্রান্সিস ডি সুজা। ডি সুজা সগর্বে জানিয়েছেন যে ভারত বরাবরই হিন্দুদের দেশ এবং এখনও তাই আছে এবং অবশ্যই ভবিষ্যতে আরও দৃঢ়ভাবে তাই থাকবে। এই মর্মে তিনি বলেন, আমাদের দেশ হিন্দু জাতির দেশ এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

গত সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে বিধান সভায় নেওয়া এক প্রস্তাবের প্রাক্কালে মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক দলের একমন্ত্রী (বিজেপি'র সহযোগী) দাভালকারের বক্তব্যের সমর্থনে তিনি এই মত ব্যক্ত করেন। বিতর্কে জল ঢালতে ডি সুজা জানান দাভালিকরের বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে। কেননা ভারত হিন্দুদের দেশ, এর নাম হিন্দুস্থান। সব ভারতীয়ই অবশ্যই হিন্দু, তার মধ্যে খৃস্টধর্মাবলম্বী তিনি নিজেও আছেন। ডি সুজা বলেন, তিনি একজন খৃস্টান হিন্দু, কিন্তু হিন্দুস্থানী। তাই ভারতকে আর নতুন করে হিন্দুরাষ্ট্র বানানোর প্রসঙ্গ অর্থহীন।

তাঁর বক্তব্যের সূত্রে ডি সুজা বলেন, ভারত একটি খোলামেলা মত বিনিময়ের দেশ। এখানে যে কেউ যে কোনো বিষয়ে বিতর্ক করতে পারে। ভারত একটি মুক্ত চিন্তার দেশ। বিতর্ক হতেই পারে। কিন্তু আমাদের সকলকে নিয়েই চলতে হবে। এটি একটি সম্মিলিত গণতন্ত্র। এখানে কেউ পরিত্যক্ত নয়।

প্রসঙ্গত গোয়া বিধানসভায় কংগ্রেস সদস্যরা দাভালিকরের বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে একে সংবিধান-বিরোধী বলে আখ্যা দেন, সঙ্গে ওয়াক আউট ও করেন। কংগ্রেসের বিরোধিতার মোকাবিলা করতে খৃস্টধর্মাবলম্বী ডি সুজার এই অকপট ঘোষণা এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে বলেই ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা।

ভারতীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলির অশনি সঙ্কেত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মহারাষ্ট্রের থানের দুই যুবকের ইসলামিক জিহাদি গোষ্ঠীতে যোগ দেওয়া ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংস্থার কপালে ভাঁজ পড়ার মতই খবর। সংবাদসূত্রে প্রকাশ, মুম্বই-এর থানে থেকে ইরাকে কাজ করতে যাওয়া যুবকদের মধ্যে চারজন হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে যায়। গৃহযুদ্ধ বিধ্বস্ত ইরাকে ইতিমধ্যে ক্ষমতাসীন শাসকদের বিরুদ্ধে ইসলামিক স্টেট অফ ইরাক ও সিরিয়া (আইএসআইএস)-পন্থী জঙ্গি গোষ্ঠী ইরাকের মসুল প্রভৃতি অঞ্চলের দখল নিয়ে নিয়েছে। ভারতের ৪০ জন নার্স ও বেশ কিছু নির্মাণ সংস্থার কর্মীরাও তাদের কব্জা থেকে সম্প্রতি ছাড়া পেয়েছে।

সংবাদসূত্র অনুযায়ী ওই নিখোঁজ চার ভারতীয় যুবকদের মধ্যে দু'জন তাদের পরিবারের সঙ্গে সম্প্রতি ফোনে যোগাযোগ করে তাদের আই এস আই এস-এর জিহাদি সংগঠনে যোগ দেওয়ার কথা জানিয়েছে। সংবাদটি সত্য হলে বুঝতে হবে ভারত কিন্তু মোটেই আন্তর্জাতিক জিহাদি আগ্রাসনের বাইরে নয়। নিরাপত্তা সংস্থার গোয়েন্দারা বিশ্বস্ত সূত্রে প্রমাণ পেয়েছেন আই এস আই এস ও আলকায়দা গোষ্ঠী ভারতে তাদের অন্তর্ঘাতের পরিধি বাড়াতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বিশেষজ্ঞ মহল মনে করছেন, এমন একটা পরিস্থিতিতে শুধু পাকিস্তানে উদ্ভূত জিহাদি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তৎপর না থেকে গোটা ব্যবস্থাকেই নতুন করে ভাবতে হবে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী কয়েক লক্ষ ভারতীয় দেশের বাইরে কাজ করেন। এর মধ্যে বড় একটা অংশ জিহাদ কবলিত ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়াও রয়েছে। এই তিনটি দেশে কিন্তু জিহাদিদের অপরাধীর চোখে দেখা হয় না। তারা আর পাঁচজন নাগরিকের মতই নিরপরাধী। এই পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কিছু ভারতীয় যুবকের জিহাদি অপরাধী গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়া মোটেই আশ্চর্যের নয়। তাদের নানা ভাবে প্রলুব্ধ করাও হয়ে থাকতে পারে। অবশ্য কেউ কেউ সন্ত্রাসবাদকে গ্রহণ করেছে বলেই তাবৎ অভিবাসী কর্মীদের সম্ভাব্য আতঙ্কবাদী ভাবা যুক্তিযুক্ত হবে না। কিন্তু থানের যুবকদের ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে ভারতে ফেরার পর জেহাদি সংস্পর্শে আসা তরুণদের অতি আবশ্যিক ভাবেই নিরাপত্তা বিভাগ দ্বারা কাউন্সেলিং দরকার। তাদের ভিনদেশী ক্ষতিকারক ধ্যান-ধারণাগুলি থেকে মুক্ত করে সঠিক পথে পরিচালিত করার পক্ষে এই পন্থা জরুরি। এমনটাই অভিমত ওয়াকিবহাল মহলের।

এই সূত্রে ইসলামীয় প্রচারক মৌলানা সালমন নাদভীর সৌদি আরব কর্তৃপক্ষকে দেওয়া খোলা চিঠিটি উল্লেখযোগ্য। নাদভী সৌদি আরবকে ৫ লক্ষ ভারতীয়ের সুন্নী সেনাবাহিনী গড়ে ইরাক ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের শিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার ডাক দিয়েছেন। মুসলমান মোল্লা সম্প্রদায় একযোগে এর বিরোধিতা করলেও কেউ কেউ এই ধর্মীয় হিংস্র আহ্বানে সাড়া দিতেও পারে।

এই সূত্রেই দেশীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলিকে কড়া হাতে চালু জিহাদি নিয়োগ ও মগজ ধোলাই সংস্থাগুলির মোকাবিলা করতে হবে। ভারত-বিরোধী যে কোনো জিহাদি বা আধা সন্ত্রাসবাদী যাই হোক না কেন স্বদেশ বা বিদেশ যেখানেই তারা মাথা তুলবে সেখানেই তাদের বিনাশ দরকার।

কেন্দ্রের তৎপরতায় কেন-বেতোয়া নদীর সংযুক্তিকরণ সেচের কাজে লাভবান হবে দুই রাজ্যের কৃষকই

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের আমলে দেশের নদীগুলি সংযুক্তিকরণের যে প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল দশ বছর পর মোদী সরকারের আমলে তা কার্যকর হতে শুরু করেছে। সম্প্রতি কেন ও বেতোয়া নদীর সংযোগের কাজ শুরু হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এই দুই নদী সংযোগের জন্য যে খাল কাটা হবে, কেন্দ্র সরকারের তরফে তার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ফলে উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের বহু চাষী জলসেচের সুবিধা পাবেন। এই প্রকল্প বহুদিন ধরে ঝুলে ছিল।

এই নদী সংযোগের ফলে উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ— দুই রাজ্যের ছয়টি জেলা পানীয় জল এবং বিদ্যুৎ পাওয়ার ক্ষেত্রেও সুনিশ্চিত হলো যা বহুদিন ধরে এখানকার মানুষ চেয়ে আসছিল। কেন-বেতওয়া নদীর সংযোগ গড়ে তুলতে দীর্ঘ ২২১ কিলোমিটার যে খাল কাটা হবে তাঁর জন্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে ৯ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই বাঁধানো খালটি উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসি, বান্দা, মাহোগ এবং মধ্যপ্রদেশের ছাত্তারপুর, পান্না এবং টিকমগড় জেলার মধ্য দিয়ে বিস্তৃত হবে। সেই সঙ্গে এই প্রকল্পের কাজ ২০১৯ সালের মধ্যে শেষ করা হবে বলে জানা গেছে। জলসম্পদ এবং নদী উন্নয়ন বিষয়কমন্ত্রী উমাভারতী লোকসভাতে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, যদি রাজ্যগুলি এক্ষেত্রে রাজি থাকে তাহলে আগামী ১০ বছরের মধ্যে দেশের সমস্ত রাজ্যে অন্তর্দেশীয় জলসেচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ফেলা হবে। সেই সঙ্গে উপকৃত রাজ্য দু'টির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রকের সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক মউ স্বাক্ষরের মাধ্যমে এই প্রকল্প কার্যকর করার ক্ষেত্রে আশ্বাস দিতে হবে। দেশের ৩০টি অন্তর্দেশীয় জলসেচন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কেন-বেতওয়া নদীর সংযুক্তিকরণ একটি। যেটি ত্রিপাক্ষিক মউ স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই সুপ্রিম কোর্টের কাছ থেকে অনুমতি পেয়েছিল। এবং সর্বোচ্চ আদালতের পক্ষ থেকে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার (ইউপিএ-২)-কে এই প্রকল্পের চুক্তি সম্পাদন করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়সীমা বলে দেওয়া হয়েছে। ১৯৮২ সালে আন্তর্দেশীয় জলসেচন প্রক্রিয়ার কাজ পাইপলাইনের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। সেই সময় থেকে সরকার জাতীয় জলসম্পদ উন্নয়ন এজেন্সি জলের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে নদী সংযুক্তিকরণ শুরু করেছিল।

হ্যাকারদের নজরে এবার সেনা-আধিকারিকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতীয় বায়ুসেনা ও সেনা-আধিকারিকদের বেতন- অ্যাকাউন্টকে এবার টার্গেট করল সাইবার অপরাধীরা। ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে সাউথ ব্লকের পক্ষ থেকে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে গত ১৫ জুলাই নাগাদ। ওইদিন জনা চল্লিশ বায়ুসেনা আধিকারিক এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করেন যে ব্যাঙ্কে তাঁদের বেতন-অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। এমনকী তাঁদের ডেবিট কার্ড থেকেও অবৈধ লেনদেন করা হয়েছে। শুধু রাজধানী দিল্লীতেই এই ঘটনা সীমাবদ্ধ নেই। জয়পুর এবং হায়দরাবাদ থেকেও একই ধরনের অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। দশ হাজার টাকা থেকে শুরু করে আড়াই লক্ষ টাকা অবধি তুলে নেওয়া হয়েছে সেনা- আধিকারিকদের অ্যাকাউন্ট থেকে। ভারতীয় তথ্য-প্রযুক্তি আইনের ৬৬ ও ৬৬ডি ধারায় বায়ুসেনার ইকোনমিক অফেনসেস উইং (ই ও ডব্লিউ) এফ আই আর দায়ের করেছে। এক্ষেত্রে ভুক্তভোগী বায়ুসেনা আধিকারিকদের সংখ্যাটা মোটামুটি চল্লিশ পাওয়া গেলেও, ভারতীয় স্থলসেনা আধিকারিকদের সংখ্যাটা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। এই সংখ্যা সম্ভবত আরও বেশি। সাইবার অপরাধী মূলত সেনা আধিকারিকদের স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার অ্যাকাউন্ট থেকেই টাকা তুলে নিয়েছে।

আমাদের দেশে এধরনের সাইবার অপরাধ নতুন কোনো ঘটনা নয়। কিন্তু খোদ সেনা আধিকারিকদের অ্যাকাউন্ট হ্যাক করার ঘটনা অবশ্যই অভিনব। তথ্যাভিজ্ঞমহল মনে করছেন বাঘের ঘরে এধরনের ঘোগের বাসা কোনো সাধারণ হ্যাকারের কর্ম নয়। ই ও ডব্লিউ এ ব্যাপারে তদন্ত চালিয়ে মনে করছে স্টেট ব্যাঙ্কের কিছু কর্মী যাঁরা এই অ্যাকাউন্টগুলি পরিচালনার দায়িত্ব রয়েছেন এবং ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং-এর যাবতীয় তথ্য যাঁদের হাতে রয়েছে তাঁরাই এধরনের অপরাধের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকতে পারেন। কিন্তু যে 'সার্ভারে'র মাধ্যমে এরকম সাইবার অপরাধ ঘটানো হয়েছে তা 'ইনস্টল' করা হয়েছে কানাডা থেকে। ই ও ডব্লিউ মনে করছে এরা ভারতের সম্পর্কে খুব ভালভাবেই সবকিছু পড়াশুনো করেছে এবং তাদের যাতে চিহ্নিত না করা যায় সে ব্যাপারে উপযুক্ত গোপনীয়তাও অবলম্বন করেছে। সেনা-অফিসারেরা এমনও বলছেন, ইন্টারনেট বা সাধারণ লেনদেনের পর তাঁদের মোবাইলে এ সংক্রান্ত যে টেক্সট মেসেজটি আসে তাতেও এর 'লোকেশন' কানাডা দেখানো হয়েছে।

আর তাতেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন সমর বিশেষজ্ঞ ও কূটনৈতিক মহল। ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বিব্রত করতে এটা কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের পরিকল্পিত চক্রান্ত কিনা তা বুঝতেই কালঘাম ছুটছে এঁদের। সূত্রের খবর হ্যাকাররা ১৬ সংখ্যার কার্ড নম্বর জানতে একটি অভিনব ও একক পদ্ধতি বের করেছে যার কূল-কিনারা এখনও করে উঠতে পারেনি দেশের কমপিউটার বিশেষজ্ঞরা। সাধারণ সতর্কতা হিসেবে সময় সময় কার্ডের পাসওয়ার্ড পরিবর্তনের পরামর্শ দেওয়া হলেও তাতে সুফল কতটা মিলবে তা নিয়ে সন্দিহান খোদ সেনাকর্তারাই। ই ও ডব্লিউ-এর যুগ্ম কমিশনার সতীশ গোলচা জানিয়েছেন তাঁরা এধরনের অভিযোগ পাওয়ার পরেই সংশ্লিষ্ট থানায় এফ আই আর রূপে বিষয়টি গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করে দিয়েছেন। তবে বিষয়টি স্পর্শকাতর ও দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত হওয়ায় এনিয়ে এখনই বিস্তারিত কিছু জানাচ্ছেন না তাঁরা।

বোলপুরে বিজেপি কর্মীদের উপর তৃণমূলী হামলা

সংবাদদাতা : বোলপুর॥ বিজেপি-র সভা পণ্ড করতে বেনজির সন্ত্রাস। কর্মীদের উপর হামলা, মারধর, বাস ভাঙচুর করে তাণ্ডব চালানোর অভিযোগ উঠল টিএমসি-র বিরুদ্ধে। সভা শুরুর পর গ্রামে গ্রামে তল্লাসি, লাঠি হাতে বাইকবাহিনীর তাণ্ডব বোলপুর মহকুমার ব্লকে ব্লকে। ইতিমধ্যেই ১২ জন বিজেপি-কর্মী জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আহতদের সভাস্থলে আনা হয়। পরে হাসপাতালে পাঠানো হয়। তা সত্ত্বেও অনুব্রত'র খাসতালুকে বিজেপি'র সন্ত্রাস বিরোধী প্রতিবাদ সভায় জনজোয়ার। সদ্য এ মাঠে মমতা জনসভাকে ছাপিয়ে গেল এদিনের বিজেপি বোলপুর ডাকবাংলো মাঠের জনসভা।

বিজেপি ঘোষিত কর্মসূচি মতো ১৬ জুলাই বুধবার বোলপুর ডাকবাংলো মাঠে শহীদ রহিম শেখ মঞ্চে সন্ত্রাস-বিরোধী জনসভার আয়োজন হয়। বিজেপি'র অভিযোগ, মঙ্গলবার রাত থেকেই ব্লকে ব্লকে জনসভায় না যাওয়ার জন্য হুমকি ও বোমাবাজি শুরু করে টিএমসি বাহিনী। বোলপুর লাগোয়া রূপপুর গ্রামের বাসিন্দা সমীর খাঁর বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজি শুরু হয়। পাড়ুই এলাকার একাধিক গ্রামে চলে রাতভর হুমকি। এদিন সকাল থেকে এলাকায় এলাকায় বিজেপি সমর্থক আনতে বাস পৌঁছতেই শুরু হয় হামলা। কঙ্কালী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার উত্তর নারায়ণপুরে দলীয় পার্টি অফিসে হামলা। ওই অঞ্চলের উত্তর নারায়ণপুরে, পদ্মাবতীপুরে বাস ভাঙচুর, ড্রাইভারকে নামিয়ে বেধড়ক মারধর। কোপাই অঞ্চলে গাড়ি আটকে রাখা হয়।

বিজেপি জেলা সভাপতি দুধকুমার মণ্ডল মাইকে ঘোষণা করতে থাকেন— 'জায়গায় জায়গায় টিএমসি লেঠেলবাহিনী মটরবাইক নিয়ে রাস্তায় নেমে হামলা শুরু করেছে। পুলিশকে জানিয়েও কোনো কাজ হচ্ছে না? তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, অবিলম্বে পুলিশ ব্যবস্থা না নিলে এরপর অশান্তি হলে টিএমসি ও পুলিশ দায়ী থাকবে।'

সভা শুরু হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই মওলা গ্রামের শেখ সামাদকে আহত অবস্থায় মঞ্চে এনে হাজির করে বিজেপিকর্মী সমর্থকরা। তিনি বলেন, বিজেপি'র সভায় আসছিলাম বলে গাড়ি থেকে নামিয়ে বেধড়ক লাঠিপেটা করে টিএমসিবাহিনী। সভায় আসা মেয়েদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে তাড়িয়ে দিয়েছে। লোক আসতে পারেনি।

হাত ভাঙা, আহত অবস্থায় মঞ্চে আনা হয় বালিগুনি গ্রামের শেখ সৌকত, ইলামবাজারের বিপ্রটিকুড়ি গ্রামের বিপদতারণ বাগ্দী সহ আরও অনেককে। বিপদতারণ বাগ্দির কপালে ধারাল অস্ত্রের কোপ। ততক্ষণে খবর আসতে শুরু করেছে, ইলামবাজারের বিলাতী অঞ্চলে বাসে আক্রমণ, আহত একাধিক।

এদিন মঞ্চে যত শেখ রহিমের স্ত্রী হাজিরা বিবি, দুই মেয়ে আমিনা বিবি, সামিনা খাতুন উপস্থিত ছিলেন। তারা বলেন, রাজ্য নেতারা পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। এদিন মঞ্চে বাবুল সুপ্রিয় ও বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা সভামঞ্চে উপস্থিত হতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে বিজেপি সমর্থকরা।

কেষ্ট মনিরুলকে কটাক্ষ করে রাহুল সিনহা বলেন, আগে টিএমসি পাটি চলত কালীঘাট লাইনে এখন চলছে বীরভূম লাইনে। সেখানে বোলপুর না লাভপুর কোন নেতার লাইনে চলবে তা নিয়ে ইঁদুর দৌড় চলছে। কারণ একজন বলছে বোমা মারতে। অন্যজন বলছে মানুষ মারতে। একজন সাগর ঘোষকে খুন করছে। একজন বলছে তিনজনকে পায়ে দলে মেরে দিয়েছি। এদিনে বিজেপিকর্মীদের আক্রমণ প্রসঙ্গে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, আমাদের কোনো লোকই যায়নি। আমাদের কেউ আক্রমণ করেছে প্রমাণ দিলে আমি ব্যবস্থা নেব।

এদিন মঞ্চে হৃদয় ঘোষ ছাড়া ইলামবাজার, বোলপুর, লাভপুর এলাকার কয়েক হাজার মানুষ বিজেপিতে যোগদান করেছেন। হৃদয় ঘোষ বলেন, মানুষ বিজেপি মঞ্চে ভরসা আশ্রয় খুঁজছে। শাসক দলের বিরুদ্ধে লড়াই করতেই বিজেপি-তে এলাম।

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে আগামী ১৮ আগস্ট, ২০১৪

জন্মাষ্টমী ও সজ্জন সমাজের ভূমিকা

পুণ্য জন্মাষ্টমী তিথিতে স্বস্তিকা ৬৭ বৎসরে পদার্পণ করছে। গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, সৎ লোকেদের পরিত্রাণের জন্য তিনি বার বার আবির্ভূত হবেন। আমাদের দেশে সাম্প্রতিককালে সজ্জন সমাজের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন নৃপেন্দ্র প্রসন্ন আচার্য এবং আরও কয়েকজন।

বাঙালি কি ভীরু, বিবেকহীন জাতিতে পরিণত হচ্ছে?

গূঢ়পুরুষের

কলম

তৃণমূলের গোষ্ঠী লড়াই, তোলাবাজি, খুন, ধর্ষণ, অপশাসন পশ্চিমবঙ্গকে নিশ্চিতভাবে আত্মঘাতের পথে অতি দ্রুত নিয়ে চলেছে। প্রয়াত লেখক নীরদচন্দ্র চৌধুরী বলতেন, বাঙালি আত্মঘাতী জাতি। বাঙালির সৌজন্যেই অষ্টাদশ শতকে ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড প্রায় দুশো বছর ধরে রাজদণ্ড হয়েছিল। আবার এই বাঙালি যুবকরাই বৃটিশ অপশাসন থেকে দেশকে মুক্ত করতে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। বাঙালির চরিত্রে দ্বৈত-সত্তা বিরাজ করছে। বাঙালি আত্মঘাতী এবং একই সঙ্গে প্রতিবাদী। তাই বাঙালির মানসিকতায় একটা দোলাচল আছে। দ্বিধা আছে। টানা ৩৪ বছর বাম জমানায় সিপিএম হার্মাদরা অত্যাচার চালিয়েছে। প্রতিবাদ করবো অথবা অত্যাচারকে মেনে নেব এই দ্বিধায় তিনটি দশক খরচ হয়ে যায়। তারপর ৩৫ বছরে বাঙালি ঘুরে দাঁড়িয়ে বামপন্থী ঘুঘুদের বাংলা ছাড়া করেছে। কিন্তু যে জনরোষে লাল ঝাণ্ডাওয়ালারা পাততাড়ি গুটিয়ে পালিয়েছিল সেই প্রতিবাদী বাঙালিরাই সবুজ তৃণমূল নেত্রীর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে বিপুলভাবে তাঁর দলকে পশ্চিমবঙ্গের শাসন ক্ষমতায় বসিয়েছে। তৃণমূল নেত্রী ঘোষণা করেছিলেন, বাংলার প্রশাসনকে দলদাস মুক্ত করা হবে। বাস্তবে কী হয়েছে। তৃণমূলের দলদাসরাই পশ্চিমবঙ্গে প্রশাসন— পুলিশকে পুরোপুরি কব্জা করেছে। তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা খুন ধর্ষণ দাঙ্গা হাঙ্গামা করেও বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে ভোটকেন্দ্রের ভিতরে তৃণমূলের মহিলা বিধায়ক রিগিং করলেও কোনো শাস্তি হয় না। 'পায়ের তল দিয়ে তিনজনকে পিষে মেরেছি' সগর্বে সর্বসমক্ষে ঘোষণা করলেও তৃণমূল বিধায়কের শাস্তি হয় না। তৃণমূল বিরোধীদের বাড়িতে এবং পুলিশের গাড়িতে বোমা মারার ফতোয়া দিলেও শাসকদলের নেতার বিরুদ্ধে মামলা হয় না। তৃণমূলের সাংসদ বিজেপি সমর্থকদের বাড়িতে ঢুকে পরিবারের মহিলাদের গণধর্ষণ করার নির্দেশ দিলেও নেত্রীর আশীর্বাদে ধন্য হন। প্রতিদিন সংবাদপত্রে, টিভি নিউজে আমরা শাসকদলের পিশাচদের প্রেত নৃত্য দেখছি, শুনছি, পড়ছি। তবু আমি আপনি আপনারা সবাই সব কিছু মেনে নিচ্ছি। ভোটের সময় এই দলকেই ভোট দিয়ে জেতাচ্ছি। সবুজ আবির মেখে আনন্দে নাচছি। আর যাদের সঙ্গে নাচছি তারাই পরেরদিন আমাদের মা, বোন, স্ত্রীদের উপর চরম অত্যাচার করছে। তৃণমূল প্রার্থীরা ৩৪টি লোকসভার আসনে জয়ী হয়েছে। কৃষ্ণনগর কেন্দ্র থেকে জয়ী তৃণমূল সাংসদ তাপস পাল বলেছেন, 'আমি চন্দননগরের মাল। পকেটে পিস্তল নিয়ে ঘুরি... ।' যে ব্যক্তি নিজেকে 'পয়মাল' বলে মনে করেন তাঁকে বিপুল ভোটে জিতিয়ে সংসদে পাঠান যাঁরা তাঁদের আত্মঘাতী ছাড়া অন্য কী বলবো আপনারাই বলুন।

রাজ্যের মানবাধিকার কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অশোক গঙ্গোপাধ্যায়কে নিশ্চয় সকলের মনে আছে। তাঁর বিরুদ্ধে জনৈকা শিক্ষানবিশ তরুণী আইনজীবী শ্লীলতাহানির অভিযোগ করেছিলেন। এই অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার আগেই তৃণমূল নেত্রীর নির্দেশে শাসকদল অশোকবাবুর অপসারণের দাবিতে জোরদার আন্দোলন শুরু করে দেয়। বাধ্য হয়েই অশোকবাবু পদত্যাগ করেন। অশোকবাবুর অপরাধ ছিল তিনি বেশ কয়েকটি মানবাধিকার সংক্রান্ত মামলায় শাসকদলের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিলেন। এখন জানা যাচ্ছে যে পরিকল্পনা করেই ওই তরুণীকে দিয়ে অসত্য অভিযোগ এনেছিল কয়েকজন প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা। অবশ্যই এই ষড়যন্ত্রের কথা নেত্রীর অজানা থাকার কথা নয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অম্বিকা মহাপাত্রকেও মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হয়। পশ্চিম মেদিনীপুরের দরিদ্র কৃষক শিলাদিত্য চৌধুরীকে স্বয়ং নেত্রী মাওবাদী তকমা দিয়ে জেলে ঢুকিয়েছেন। কামদুনি ধর্ষণকাণ্ডের প্রতিবাদী গৃহবধূকেও নেত্রী মাওবাদী বলেছেন। কামদুনি-সহ সারা রাজ্যের মহিলাদের ভাগ্য ভাল যে সমস্ত ধর্ষিতাদেরই নেত্রী মাওবাদী তকমা লাগিয়ে দেননি। বহুকাল আগে শ্রদ্ধেয় প্রয়াত চলচ্চিত্র পরিচালক তপন সিংহ তাঁর পরিচালিত 'আদালত ও একটি মেয়ে' ছবিতে ধর্ষিতা এবং তাঁর পরিবারের অপমান ও আত্মগ্লানিতে তিল তিল করে ভেঙে পড়ার কাহিনী দেখিয়েছিলেন। শ্রদ্ধেয় প্রবীণ অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল ইংরেজি পত্রিকা 'দ্য স্টেটসম্যান' কাগজে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধে ধানতলা, নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর ইত্যাদি এলাকায় গণধর্ষণকাণ্ড সম্পর্কে লিখেছিলেন— 'রেপ ইজ দ্য নিউ ওয়েপন অফ দ্য সিপিএম টু ব্রেক দ্য মরাল অফ দ্য অ্যাজিটেটিং পিপল।' সঠিক কথা। পরিবারের কন্যা বা বধূ একদল পিশাচের হাতে ধর্ষিতা হলে সেই পরিবারতো বটেই, এলাকার প্রতিটি বাড়িতে যে আতঙ্ক ছড়ায় তা মানুষকে রক্তশূন্য করে দেয়। ভয়ে আতঙ্কে মানুষ প্রতিবাদের সাহসটুকুও হারিয়ে ফেলে। এই রাজ্যে প্রায় তিন বছরের শাসনে তৃণমূল শাসকরা দেখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে বাঙালির মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া যায়। বিগত তিন বছরে এই রাজ্যে একজনও ধর্ষকের বিচার সম্পন্ন করে সাজা দেওয়া হয়নি। গার্ডেনরিচে কলেজে শাসক দলের দাঙ্গা চলাকালে দুষ্কৃতীদের গুলিতে পুলিশ কর্মীর মৃত্যু হলেও সাজা হয় না। বীরভূমের তৃণমূল নেতা দলীয় কর্মীদের পুলিশের গাড়িতে বোমা মারার নির্দেশ দিলেও নেত্রীর আশীর্বাদে অবৈধভাবে লালবাতি লাগানো গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়ায়। দুঃখ হয়, যখন দেখি অত্যাচারিত মানুষগুলি অত্যাচারী শাসকদলের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে জয়ী করান। বাঙালি কি ভীরু, বিবেকহীন জাতিতে পরিণত হচ্ছে? সত্যি জানতে ইচ্ছা করে।

তিন বছরেই শুদ্ধিকরনের ডাক লবিবাজি নিপাত যাক

মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো
হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা

দিদি, এই চিঠি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখছি না। সম্বোধনে তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো লিখলেও তাঁকেও লিখছি না। লিখছি আমার প্রিয় দিদিভাইকে। দিদির কষ্টে যেভাবে ভাইয়ের বুক ফেটে কান্না পায় আমার অবস্থাও ঠিক তেমন। আপনি জানেন না যে, আপনি প্রকাশ্যে না বললেও আমি অনেক কথাই বুঝতে পারি। অনেক না বলা কষ্ট অনুভব করতে পারি। শুধু আমি নয়, আপনার গুণগ্রাহী অনেক ভাইই সেটা পারে। আমি যে তাদেরই একজন।

দিদি, দুধ-কলা দিয়ে আপনি কাল-সাপ পুষছেন। সত্যিই কাল-সাপ। যারা আপনার খেয়ে, আপনার পরে আপনার বিরুদ্ধেই এখন ষড়যন্ত্র করছে। দিদি আমি জানি সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে যতই আপনি কুৎসা আর ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলুন না কেন আসলে ষড়যন্ত্রকারীরা আপনার ঘরেই। তারাই তলে তলে সংগঠনের ভিতর সংগঠন, গোষ্ঠীর ভিতর গোষ্ঠী, তার ভিতরে গোষ্ঠী বাড়িয়ে আপনাকে আজ চক্রব্যূহের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছে। তোলাবাজি, সিন্ডিকেটের জালে আপনি নিজেও জড়িয়ে পড়ছেন। আপনি এখন নিজেও হাড়ে হাড়ে তা টের পাচ্ছেন। তাই তো অনেকগুলো কথা সেদিন একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে ঘোষণা করতে হলো আপনাকে।

দিদি, বরাবরই একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ আপনার শক্তি প্রদর্শনের মঞ্চ। ক্ষমতায় আসার পর ভিড় টানতে পাগলু ড্যান্স, তারকা গান দরকার হলেও বিরোধী-নেত্রী হিসেবে আপনি নিজেই সেই সমাবেশ কানায় কানায় ভরিয়ে তোলার জন্য যথেষ্ট ছিলেন। এখনও হয়তো আছেন। তবু ভয় পেয়ে তাদের আনতেই হয়। তাছাড়া রাজ্যের সব তারকাই তো এখন আপনার দলের লোক। গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে আমি ওই সমাবেশের সাক্ষী। প্রতিবার ওই একুশে জুলাইয়ের ভিড় বুঝিয়ে দিয়েছে শক্তি বাড়ছে আপনার। না, দলের নয় আপনার। আর দুর্বল হচ্ছে বামফ্রন্টের মাটি। প্রতিবার সেই মঞ্চ থেকে একের পর এক কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন আর উজ্জীবিত করেছেন সংগঠনকে। এমনকী মহাকরণ দখল করার পর যেবার ব্রিগেডে নিলেন সমাবেশ সেবারও একলা লড়ার ঘোষণা করে খবরের শিরোনাম হয়েছেন। আর সেই ঘোষণা যে নিছক ফাঁকা আওয়াজ ছিল না তা বুঝিয়ে দিয়েছে পঞ্চায়েত থেকে লোকসভা একের পর এক নির্বাচনের ফল।

কিন্তু এবার আর তেমন কোনো কর্মসূচির ঘোষণা শোনা গেল না। বরং শোনা গেল দলে শুদ্ধিকরণের বার্তা। আপনাকে সেদিন বলতে শুনলাম, লবিবাজি করে নেতা হওয়া যাবে না। ভাল কাজ করলে দলই নেতা খুঁজে নেবে। সেই যথার্থ নেতা যে মাটির সঙ্গে মিশে থাকে। আপনি যখন এসব বলে ভাইদের ধমকাচ্ছেন তখনই আমি বুঝতে পেরেছি আপনার কষ্ট। বুঝতে পেরেছি, ক্ষমতার তিন বছর হতে না হতেই এমন শুদ্ধিকরণের বার্তা দিতে হবে আপনি ভাবেননি। আপনি ভাবেননি, এর মধ্যেই তোলাবাজির জন্য শিল্পমহল রুষ্ট হয়ে উঠবে। ভাবেননি আপনাকে শিল্পমহলের উদ্দেশে বারবার বলতে হবে, কেউ কাউকে টাকা দেবেন না। বলতে হবে ভাবেননি যে, টাকা চাই না, টাকার জন্য আপনি নিজেই আবার ছবি আঁকবেন, বই লিখবেন।

আপনার পায়ে হাওয়াই চটি যেমন একটা স্টাইল স্টেটমেন্ট হয়ে গেছে দিদি, তেমনই আপনার ভাইদের মাথার চুল থেকে পায়ের জুতোয় ব্র্যান্ডেড কোম্পানির বিজ্ঞাপন। মোবাইল ফোনের চেহারা দেখলে শিল্পপতিরা চমকে যাবেন। আর গাড়ি, বাড়ি সেসব তিন বছরে যতটা হয়েছে ততটা তিন দশকে করে উঠতে পারেননি সিপিএম নেতারা। এসবই আপনি দেখতে পান, বুঝতে পারেন, শুনতে পান কিন্তু কাকে কী বলবেন? ঠগ বাছতে গাঁ উজার হয়ে যাবে। এরপর সিন্ডিকেট, মনিরুল, আরাবুল, অনুব্রত, তাপসের মতো রতন তো আছেই।

সত্যিই দিদি আপনার কাছে এসব প্রশ্নের জবাব নেই।

আপনি সেদিন মঞ্চে সিপিএমের বিরুদ্ধে সামান্য সময় ব্যয় করে যেভাবে বিজেপি-কে নিয়ে পড়লেন তাতে অনেকেই মনে করছে আপনি ভয় পেয়েছেন। আগামী দিনে বিজেপি'র মোকাবিলা করতে এখন থেকেই জমি প্রস্তুত করতে চাইছেন। আর সেসব সবাই বুঝেছে। আপনার ভাইয়েরাও। ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আপনার এক গুছিয়ে নেওয়া ভাইয়ের বক্তব্য— দিদি যতই বার্তা দিন সবাই বুঝেছে ক্ষমতা থাকতে থাকতে গুছিয়ে নিতে হবে। ক্ষমতা আজ আছে কাল নেই। আর ইতিমধ্যেই দলের জনপ্রিয়তা কমছে। জল মিশিয়ে বারবার ভোটে জেতা যায় না। সুতরাং তোলাবাজি জিন্দাবাদ, সিন্ডিকেট জিন্দাবাদ। ঘুছিয়ে নেওয়া চলছে, চলবে।

— **সুন্দর মৌলিক**

BRICS-সম্মেলনে মোদী

চীনের সঙ্গে জোট বাঁধা নয়, বরং রোখাটাই জরুরি

এন. সি. দে

ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বেসরকারি টিভি চ্যানেলের দৌলতে বি আর আই সি এস কথাটি ইতিমধ্যে সাধারণ মানুষের কাছে একটি পরিচিত শব্দ। তবে সেইটুকুই মাত্র। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা সৃষ্ট দীর্ঘ কংগ্রেসী শাসনের কুফল এদেশের সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রীয় চেতনাহীন এবং জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিস্পৃহ-নিষ্ক্রিয় একটি বিচিত্র মানবগোষ্ঠী। এর কারণ এদেশের কংগ্রেসী ও তার স্তাবক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। এঁরা সংসদে জাতীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ের চেয়ে প্যালেস্তাইনের মুসলিম জঙ্গিগোষ্ঠী 'হামাস'-এর জঙ্গি হানার বিরুদ্ধে ইসরায়েল সরকারের সামরিক অভিযানের নিন্দা প্রস্তাব নিয়ে বেশি আগ্রহী এবং এই নিয়ে বিতর্কে সংসদ অচল করে রাখে। এটা নাকি আমাদের নৈতিক কর্তব্য। আমাদের দেশের অভ্যন্তরে ও সীমান্তে যত্রতত্র বহুবার পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গি বাহিনী হামলা চালিয়ে বহু মানুষকে হত্যা করেছে। কখনও আমাদের সৈন্যবাহিনীর মুণ্ডু কেটে নিয়ে চলে যাচ্ছে; কখনও সীমান্ত রক্ষীদের চোখ উপড়ে নিচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও রেল স্টেশনে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে মানুষ হত্যা করছে। শুনেছেন কখনও কোনো দেশ, বিশেষ করে মুসলমান রাষ্ট্র তাদের সংসদে পাকিস্তানের জঙ্গি হানার বিরুদ্ধে কোনো নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করেছে?

এই হলো আমাদের বিজেপি বাদে সমস্ত দলীয় নেতাদের জাতীয়তা-বিরোধী আচরণ। সেই দেশের মানুষের পক্ষে নিজ রাষ্ট্রীয় স্বার্থ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করাটাই বাজে সময় নষ্ট করা বলে ধরে নেওয়াটাই রেওয়াজ। এদেশের মানুষের এই স্বভাবের কারণে বিদেশীরা আমাদের দেশের সঙ্গে অনেক সম্মেলনে অনেক চুক্তি করে যা দেশের স্বার্থ-বিরোধী। কংগ্রেসী আমলে এই রকম ৮২টি Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement (BIPA) হয়েছে। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে করা CECA, CEPA, FTA প্রভৃতি চুক্তি। কংগ্রেসী বাণিজ্য মন্ত্রী আনন্দ শর্মা স্বয়ং সংসদে স্বীকার করেছেন যে ৮০টি দেশের সঙ্গেই আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি হয়েছে বিপুল। এর একটিই কারণ, তাহলো আমরা ওইসব দেশ থেকে শুধুই পণ্য আমদানি করেছি অর্থাৎ কিনেছি। নিজের দেশের পণ্য রপ্তানি করেছি অর্থাৎ বিক্রি করেছি যৎসামান্য। পরিণামে অর্থ চলে গেছে বিপুল, অর্থ এসেছে কম। ফল বাণিজ্য ঘাটতি, বাণিজ্য ঘাটতি মানেই রাজকোষ ঘাটতি।

BRICS সম্মেলন সম্পর্কে লিখতে গিয়ে এতসব কথা বলার একটিই কারণ, তাহলো, দেশের সরকারের বিদেশের সঙ্গে করা যে কোনো দল চুক্তি করে ভারত সরকার হিসেবে। দল হিসাবে নয়। তাই একটি দলের করা চুক্তি অন্য দলের সরকার ও জনগণের উপর বর্তায়। সম্মেলনের আগের দিন আমাদের দেশের বর্তমান বাণিজ্য মন্ত্রী নির্মলা সীতারমন অন্যান্য দেশের বাণিজ্য মন্ত্রীর সঙ্গে এক যৌথ শপথ পত্রে সই করেছেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও শীর্ষ বৈঠকে যৌথ ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেছেন, যার নাম ফর্তেলেজা ঘোষণাপত্র (Forteleza Declaration)। ফর্তেলেজা ব্রাজিলের একটি শহরের নাম যেখানে হয়েছে এবারের শীর্ষ বৈঠক।

BRICS একটি শব্দ নয়। এটি ৫টি দেশের নামের ইংরেজি আদ্যাক্ষর। ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও সাউথ আফ্রিকা। এই ৫টি দেশ মিলে একটি গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর যৌথ মঞ্চের প্রথম সম্মেলন হয় ১৬ জুন, ২০০৯ রাশিয়ার ইয়েকেটারিনবার্গ-এ। সাউথ আফ্রিকা প্রথমে এই গোষ্ঠীতে ছিল না। ২০১১ সালের ১৪ এপ্রিল চীনের সানিয়ায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় সম্মেলনের আগে তারা এই গোষ্ঠীতে যোগ দেয়। চতুর্থ সম্মেলনটি হয় আমাদের দেশের নয়া দিল্লীতে ২৯ মার্চ, ২০১২-তে। উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। এবারের সম্মেলনটি ষষ্ঠ সম্মেলন, হচ্ছে ব্রাজিলের ফর্তেলেজায়, উপস্থিত ছিলেন ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী বিজেপি-র নরেন্দ্র মোদী।

এতো গেল BRICS-এর সংক্ষিপ্ত গঠন প্রক্রিয়ার কথা। এবার দেখব যৌথ মঞ্চটির উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কার্যাবলী। এর পিছনে রয়েছে পুঁজিবাদের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে বাজার দখলের সাম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগিতা। পুঁজির জোরে সাম্রাজ্যবাদীরা নানান জোট ঘোট, প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেয়, যেমনটি হয়েছে অতীতে IMF, World Bank, WTO, ITO, UNO, NATO, GATT, COMECON, Commonwealth ইত্যাদি। এগুলির নেতৃত্ব কিন্তু সব সময় থেকেছে ইউরোপ ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিধর দেশগুলির হাতেই। যেমন IMF- এর সভাপতি হবে সব সময়ই ইউরোপীয় ইউনিয়ন-ভুক্ত দেশের কেউ; আবার World Bank-এর সভাপতি পদে বসবে আমেরিকার কেউ। BRICS-এর মঞ্চটিও আঞ্চলিক আধিপত্যকামী চীনের মস্তিষ্কপ্রসূত কিছু নয়তো? বিগত সম্মেলনগুলির ফলাফল থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

এই যৌথ মঞ্চের মূল ভাবনা Broad Vision ও Shared Prosperity। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কীর্ণতাহীন অবাধ দৃষ্টিভঙ্গি ও সম্পদে সমান অংশীদারি। কিন্তু যে মঞ্চে দুটি সদস্য দেশ রয়েছে যাদের মধ্যে রয়েছে আধিপত্যবাদী দুই কমিউনিস্ট

দেশের জিন। তারা কেমন করে মুক্তমনা অবাধ হৃদয়বান হতে পারে? স্বাভাবিক ভাবেই দ্বিতীয় সম্মেলন থেকে রাজনৈতিক বিষয়ের অনুপ্রবেশ ঘটে। আগের কংগ্রেসী সরকারও বারবার চীনকে বাণিজ্য ঘাটতি দূর করার অনুরোধ জানায়। কিন্তু মিন মিন করে করা ওই অনুরোধে চীন আজও কর্ণপাত করেনি। চীন-ভারত বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাড়ানোর একটা অর্থই চীন জানে তা হলো ভারতের বাজার দখল করা। ভারতকে চীনের পণ্যের বাজারে পরিণত করাই তার উদ্দেশ্য। নিজের দেশে ভারতীয় পণ্যের বিক্রির পথে রয়েছে নানান বাধা। যাকে WTO-র ভাষায় বলা হয় Trade Distortion Mechanism। যে মেকানিজমের অজুহাতে ভারতের আম, পান ও ওষুধপত্রও বিদেশের বাজারে ঢুকতে দেওয়া হয় না। পরিণামে চীনের সঙ্গে বাণিজ্যে ভারতের হয়েছে বিপুল ঘাটতি। ২০০৭-০৮-এ ভারত চীনে পণ্য রপ্তানি করেছিল ১০.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের। উল্টোদিকে চীন ভারতে পণ্য রপ্তানি করেছে ২৯.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের; অতএব বাণিজ্য ঘাটতি ভারতের (-) ১৯.০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সেই ঘাটতিই ২০১২-১৩ সালে দাঁড়ায় (-) ৪০.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। ভারত চীনে রপ্তানি করেছিল ১৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং চীন ভারতে পণ্য রপ্তানি করেছিল ৫৪.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চীনের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন চীনের সঙ্গে বাণিজ্য ২০১৫ সালের মধ্যে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে নিয়ে যাবেন, আর ঘাটতি? ভারত সরকার বারবার চীনকে অনুরোধ করেছে বাণিজ্যে ঘাটতি মেটানোর জন্য। চীনা প্রধানমন্ত্রী ওয়েন জিয়াবাও ২০১০-এর ডিসেম্বরে ভারতে এলে তাঁকেও অনুরোধ করা হয়। কিন্তু চীন প্রতিশ্রুতি দিলেও কাজের কাজ কিছু করেনি।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও ব্রাজিলে গিয়ে অনুরোধ করেছেন কোনো জোট সঙ্গী দেশ যেন নিজের বাজারে অন্য সদস্য দেশের পণ্য প্রবেশে বিধিনিষেধ আরোপ না করেন। কতটা চীন শুনবে সেটা ভবিষ্যতই বলবে। এর আগেও চীন-রাশিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলিকে অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য বন্ধ এবং কোনো অঞ্চল যাতে জঙ্গিদের স্বর্গরাজ্য না হয়ে পড়ে তার জন্য যৌথভাবে মোকাবিলা করবে। নিরাপত্তা পরিষদে ভারতকে স্থায়ী সদস্য করার জন্য সাহায্য করবে; বিশ্ব ব্যাঙ্কের সভাপতি হিসেবে উন্নয়নশীল দেশগুলির কাউকে সভাপতি করতে সমর্থন করবে। এর কোনোটাই হয়নি পারস্পরিক সমঝোতার অজুহাতে। এবারের সম্মেলনে চীন তার মনমতো কাজটি করিয়ে নিয়েছে। গঠিত হচ্ছে পাঁচটি দেশের নতুন ব্যাঙ্ক New Development Bank (NDB)। ভারতের দাবি মেনে এই ব্যাঙ্কের হেড কোয়ার্টার দিল্লীতে করা হয়নি, হয়েছে চীনের সাংহাইতে। তবে ভারতের দাবি মেনে এই ব্যাঙ্কের প্রাথমিক মূলধনের (৫০ বিলিয়ন ডলার) শেয়ার সকল সদস্যের সমান হবে যাতে সকলের ভোটাধিকার সমান হয়। চীন মুখে এর বিরোধিতা না করলেও চীনা সরকারি টিভি (China Central Television (CCTV) মারফত চীনের সঙ্গে অন্যান্য দেশের সমান ভোটাধিকার তত্ত্ব নিয়ে কটাক্ষ শুরু করে দিয়েছে। এই ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য আর্থিক সঙ্কটাপন্ন সদস্য দেশকে ঋণ দেওয়া। আই এম এফ ও ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কেরও একই উদ্দেশ্য। তবে এই নতুন ব্যাঙ্কের কী প্রয়োজন? স্বদেশপ্রেমিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এর উদ্দেশ্যও পশ্চিমী দেশগুলোর মতোই চীনের একটি শক্তিকেন্দ্রে পরিণত হওয়ার চেষ্টা। এছাড়াও মজার ব্যাপার হলো চীন একটি আলাদা Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB) গঠন করার কথাও ঘোষণা করেছে গত অক্টোবরে তার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ভ্রমণের সময়।

মনে রাখা দরকার, বর্তমানে চীনের বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডারে রয়েছে ২৮ লক্ষ কোটিরও বেশি বিদেশি মুদ্রা, যা সব কটি বি আর আই সি এস দেশের ৪ ভাগের তিন ভাগই চীনের। এই বিপুল ভাণ্ডার নিয়ে সে আমেরিকার সঙ্গে পাল্লা দিতে চায় মুদ্রা যুদ্ধে। ইতিমধ্যেই চীন আমেরিকাকে তোয়াক্কা না করে ইয়েনের মূল্য বাড়িয়ে চলেছে। আমেরিকা কিছুই করতে পারেনি। এবার সে ভারতকে নিয়ে ডলারের বিরুদ্ধে লড়তে চায় এই ব্যাঙ্কের মাধ্যমে। কারণ ইতিমধ্যেই তারা ডলারের বিকল্প মুদ্রা চালুর প্রস্তাব নিয়ে ফেলেছে। তাদের আধিপত্যবাদের নমুনা ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছে। আর্থিক আধিপত্যের উদ্দেশ্যে তারা চীনের সঙ্গে মধ্য এশিয়ার যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়তে তৈরি করছে Silk Road Ecomomic Belt এবং চীনের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ভারত মহাসাগরকে জুড়তে গড়তে চলেছে Maritime Silk Road। দক্ষিণ চীনের চেঙ্গদুতে গড়ে উঠেছে এশিয়ার বৃহত্তম rail cargs base। ইউরোপে দ্রুত পৌঁছানোর জন্য কাজাখাস্থান, রাশিয়া ও বেলারুশের মধ্য দিয়ে রেল লিঙ্ক গড়া হচ্ছে। পশ্চিম চীন থেকে মধ্য এশিয়ার মধ্য দিয়ে ইউরোপ পর্যন্ত এবং দক্ষিণ-পশ্চিম চীন থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্য দিয়ে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত পাতছে হাই-স্পীড লাইন।

চীন আজ সম্পূর্ণ আধিপত্যকামী, অপরিণামদর্শী শক্তিতে পরিণত হতে চলেছে। তার বিপুল অর্থভাণ্ডার ও কম-মজুরি-প্রাপ্ত, শ্রম-কল্যাণ-আইন বর্জিত বিশাল মজদুর বাহিনী তাকে বিশ্ব বাজার দখলের স্বপ্নে বিভোর করে তুলেছে। এমন একটি দেশের সঙ্গে ভারতের জোট বাঁধা কখনই উচিত নয়। চীন ভারতের মহৎ বন্ধু নয়। ভবিষ্যতেও সে তা হতে পারবে না। বরং চীনকে রোখাটাই জরুরি। নরেন্দ্র মোদীর উপর আজ দেশের মানুষের অগাধ ভরসা ও বিশ্বাস আছে। তাঁর মতো একজন সাহসী, সুচতুর স্বদেশী দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন জাতীয় আত্মনির্ভরশীল রাষ্ট্র গঠনের কারিগরই পারবেন দেশকে সঠিক রাস্তায় নিয়ে যেতে। এখন শুধু ভবিষ্যতের অপেক্ষা। ■

সংশোধনী

স্বস্তিকার ২১ জুলাই সংখ্যার ১২ পৃষ্ঠায় ১ম স্তম্ভের ষষ্ঠ পংক্তিতে 'সহিষ্ণুতা' স্থানে 'অসহিষ্ণুতা' পড়তে হবে। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত ও ক্ষমা প্রার্থী।

—সম্পাদক, স্বস্তিকা।

রাজ্যে রাজ্যে রাখিবন্ধন

নবকুমার ভট্টাচার্য

রাখিবন্ধন প্রথমে ছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠান কিন্তু আজ তা সামাজিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। সুপ্রাচীনকালে বৈদিক ঋষিরা যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় যজ্ঞবেদী রক্ষার জন্য

যজ্ঞবেদীর ধ্বজে সুতো বেঁধে দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাতেন। এই ঐতিহ্য এখনও আমরা দেখতে পাই যে কোনো দেবতার পুজোমণ্ডপে গেলে সেখানে তিরকাঠি দিয়ে সূত্র বেষ্টন এবং দেবতার হাতে ও দেবতার ঘটে এখনও সুতো বাঁধা হয়ে থাকে। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী তাঁর 'হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান' গ্রন্থে রাখিবন্ধন প্রসঙ্গে লিখেছেন, ''রাখিবন্ধনের প্রচলন বাংলাদেশে তেমন ছিল না। আধুনিক যুগে বাংলাদেশে ঐক্যবন্ধনের প্রতীকরূপে নতুন ভাবে রাখিবন্ধনের প্রবর্তন করা হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ প্রসঙ্গে। বিহার ও উত্তরপ্রদেশে ইহা একটি বিশেষ জনপ্রিয় উৎসব। এই উপলক্ষে মঙ্গল কামনা করিয়া একজন আর একজনের হাতে মঙ্গলসূত্র বা রাখি বাঁধিয়া দেয়— অনেক ক্ষেত্রে শুভ কামনা-সহ ডাকে রাখির সূতা পাঠাইয়া দেওয়া হয়।'' এই উৎসবের উৎপত্তি সম্বন্ধে চিন্তাহরণ জৈনদের একটি প্রচলিত কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। ভবিষ্যপুরাণ থেকে জানা যায়, দেবতা অসুরদের কোনো এক যুগের সময় দেবর্ষি নারদ দেবতাদের রক্ষার জন্য দেবতাদের হাতে রাখি বেঁধে দিয়েছিলেন। আজ নিজেকে রক্ষার জন্য ডোর বাঁধা হয় বিপত্তারিণী ব্রততে। এছাড়াও শারদীয়া দুর্গাপুজোর অষ্টমী তিথিতে যে ধারাষ্টমী ব্রত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা দেখা যায়, সেখানেও মহিলাদের হাতে ডোর বাঁধার ব্যবস্থা রয়েছে।

রাখিবন্ধন যে মানুষে মানুষে মিলনের বন্ধনসূত্র তার পরিচয় মেলে আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণে। রামায়ণের কিস্কিন্ধ্যা কাণ্ড থেকে জানা যাচ্ছে, ঋষ্যমূক পর্বতে রামের সঙ্গে সুগ্রীব ও হনুমান-সহ বানরদের পরিচয়ের পর বন্ধুত্ব ও মিলনের প্রতীক হিসেবে সকলের হাতে রামচন্দ্র পুষ্পডোর বেঁধেছিলেন। মহামান্য তিলক এই ভাবনা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সমগ্র দেশে। যদিও বর্তমানে রাখির যে উৎসব, বলাই বাহুল্য তা বহু যুগের বিবর্তনের ফল। রাখি আসলে দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত এক পবিত্র সূত্রগুচ্ছ ছাড়া আর কিছুই নয়। যেহেতু তা দেবতার উদ্দেশে সমর্পিত সেহেতু তা ধারণকারীকে রক্ষা করে সর্ববিপদ থেকে। শাস্ত্রে রক্ষাবন্ধন উৎসবকে পুণ্যপ্রদায়ক বলা হয়েছে। বাংলা পঞ্জিকায় রাখিবন্ধনের মন্ত্র রয়েছে— ''যেন বদ্ধো বলী রাজা দানবেন্দ্রো মহাবলঃ। তেন ত্বাং প্রতিবধ্নামি রক্ষে মা চল মা চল।''

দৈত্যকুলের অধিপতি বলি ছিলেন প্রবল ধার্মিক। বামন অবতারে বিষ্ণু তাঁর কাছ থেকে ত্রিপাদ ভূমির নামে স্বর্গ ও মর্ত্য অধিকার করে শেষ পাদটি ন্যস্ত করেন বলির মস্তকে। বলির এর পর ঠাঁই হয় পাতালে এবং তিনি মগ্ন হন বিষ্ণুর আরাধনায়। বলির আরাধনায় তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু এক সময় অবস্থান করতে থাকেন বলির প্রাসাদে। বৈকুণ্ঠধামে স্বামীসঙ্গহারা লক্ষ্মীদেবী এক সময় বিরহযন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ব্রাহ্মণীর ছদ্মবেশে আশ্রয় নেন বলির রাজধানীতে। অতপর শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন সেই ব্রাহ্মণী রাজা বলির হাতে মঙ্গল কামনা করে বেঁধে দেন পবিত্র সূত্রগুচ্ছ। বলি তখন এই অপরিচিতা ব্রাহ্মণীকে তাঁর পরিচয় জানাতে বলেন এবং এও জানতে চান যে বিনিময়ে তিনি কী চান। লক্ষ্মীদেবী তখন স্বরূপ ধারণ করে বলির কাছে বিষ্ণুকে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলেন। পৌরাণিক মতে এই দিন থেকে শুরু হয় রক্ষা বন্ধন উৎসব। সেই প্রথা মতোই এই দিন বোনেরা এক পবিত্র সূত্রগুচ্ছ বেঁধে দেয় ভাইয়ের হাতে। বিনিময়ে ভাইরা যথাসাধ্য তাদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে। রাজস্থান-সহ উত্তর ভারতে বোনেরা ভাইয়ের হাতে রাখি বাঁধে, ওড়িশা ও অসমেও এই রীতি প্রচলিত। মহাভারত মতে, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে এই দিন শিশুপালকে বধ

করেছিলেন কৃষ্ণ। শিশুপাল বধের সময় চক্রধারণের জন্য কৃষ্ণের একটি আঙ্গুল থেকে কিঞ্চিৎ রক্তপাত হয়। তৎক্ষণাৎ তা নিবারণের জন্য দ্রৌপদী নিজের বস্ত্রাঞ্চল ছিঁড়ে তা বেঁধে দেন কৃষ্ণের আঙ্গুলে। এই ঋণ কৃষ্ণ শোধ করেছিলেন বস্ত্র হরণের সময় দ্রৌপদীর সম্মান রক্ষা করে।

দেবতাদের রাজা ইন্দ্র শতচেষ্টা করেও কিছুতেই পরাজিত করতে পারছিলেন না বৃত্রাসুরকে। অবশেষে তিনি দেবগুরু বৃহস্পতির শরণাপন্ন হন। বৃহস্পতি ইন্দ্রের বিজয় কামনায় মন্ত্রোচ্চারণ করে একটি পবিত্র সূত্রগুচ্ছ অর্পণ করেন ইন্দ্রপত্নী শচীকে। শচী শুদ্ধ চিত্তে তা ইন্দ্রের হাতে বেঁধে দেওয়ার পর ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করতে পারেন। শরৎকালে দুর্গোৎসবের পর সেকালের রাজারা যুদ্ধের অভিযানে যেতেন। এই যুদ্ধযাত্রার পূর্বে তাঁর দেবী অপরাজিতার আরাধনা করে বিজয় কামনায় সাদা অপরাজিতা লতা মন্ত্রপূত করে হাতে বাঁধতেন। আজও দুর্গাপুজোর পর অপরাজিতা পুজোয় সমগ্র বছরের শুভ কামনায় এই লতাডোর বাঁধা হয়। যে মন্ত্র পাঠ করা হয়— হারেণ তু বিচিত্রেণ ভাস্বৎকনকমেখলা। অপরাজিতা ভদ্ররতা করোতু বিজয়ং মম।"

রাখি নিয়ে এক জনশ্রুতি রয়েছে। শোনা যায় গ্রীকবীর আলেকজান্ডারের

ওড়িশা, তামিলনাড়ু ও কেরলে রাখী উৎসব উপক্রমণম্।

পত্নী পুরুর সৈন্যবলের কথা শুনে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছিলেন। তাই তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে স্বামীর যাতে কোনো অনিষ্ট না হয় তা প্রার্থনা করে রাখি পাঠান পুরুর কাছে। ভারতে এসে তিনি এই পরম্পরার কথা শুনেছিলেন। পুরু তাঁর প্রার্থনা রেখেছিলেন এবং যুদ্ধের সময় সেজন্য তিনি আলেকজান্ডারকে আঘাত করেননি, কেবল আত্মরক্ষা করেছিলেন। অবশ্য এর পরিণাম আমাদের সবার জানা। 'পূজা পার্বণের উৎসকথা' গ্রন্থে ড. পল্লব সেনগুপ্ত লিখেছেন, 'রাখি এক ধরনের মিলন প্রতীক বলেই পরিগণ্য।' রাখি মঙ্গলের প্রতীক, ঐক্যেরও প্রতীক। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় রাখি বন্ধনকে মাধ্যম করেছিলেন। রাখিবন্ধন আজ জাতীয় উৎসবে পরিণত। রাখিবন্ধনের আরোও প্রয়োজন একারণে আমাদের নিজেদের বিভেদ বিদ্বেষের ফলে নানা অশুভ দেশবিরোধী শক্তির উত্থান ঘটছে। কাশ্মীর থেকে অসম অশুভ শক্তির কূটকৌশলে দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে বসেছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রসংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ দেশের ঐক্য এবং মিলন প্রয়াসে রাখিবন্ধন পালন করে চলেছে।

তামিলনাড়ু ও কেরলে রাখি উৎসব 'মহাসঙ্কল্পম্'।

শ্রাবণ মাসের অন্তিম পূর্ণচন্দ্রে তিথি এই শ্রাবণী পূর্ণিমায় সমগ্র ভারতে একাধিক ধর্মীয় কৃত্যও পালন হয়। দক্ষিণ

তামিলনাড়ু, কেরল, ওড়িশা ও মহারাষ্ট্রের বেশ কিছু অংশে এই দিন পালিত হয় শুদ্ধিকরণ উৎসব হিসেবে। স্থানীয় নাম 'অভনি অভিত্তম্' বা 'উপক্রমণম্'। এই উৎসব পুরোপুরি ব্রাহ্মণদের। ধর্মবিশ্বাসী ব্রাহ্মণেরা এই দিন প্রথমে পূর্বকৃত পাপ মোচন এবং নতুন পাপ থেকে নিজেদের বিরত রাখার জন্য এক সঙ্কল্প করেন। যার নাম 'মহাসঙ্কল্পম্'। তারপর কোনো নদীতে স্নানের পর তাঁরা ধারণ করেন নতুন যজ্ঞোপবীত। এই যজ্ঞোপবীত ধারণের সময় মন্ত্রোচারণ করে বলেন, 'এই যে যজ্ঞোপবীত ধারণ করলাম যা অত্যন্ত পবিত্র, ঈশ্বরের সঙ্গে এর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এই যজ্ঞোপবীত জীবনকে সহজ করে, ব্রাহ্মণকে চিহ্নিত করে ব্রাহ্মণরূপে। এই যজ্ঞোপবীতের মাধ্যমে আমরা যেন জীবনযাপনের শক্তি অর্জন করতে পারি এবং তা যেন আমাদের যথোপযুক্ত মর্যাদামণ্ডিত করে তোলে'। এর পরবর্তী ছয় মাস তাঁরা মগ্ন হয় যজুর্বেদপাঠে। উল্লেখ্য ভগবান বিষ্ণু হয়গ্রীব অবতারে এই দিনই সমুদ্র থেকে বেদ উদ্ধার করে তা সমর্পণ করেন ব্রহ্মাকে। সেই ঘটনার স্মরণে পালিত হয় এই ধর্মকৃত্য। গুজরাটে আবার এই দিন পালন করা হয় 'পবিত্রপণ' নামে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের। এই পবিত্রপণ অনুষ্ঠানে আমরা দেখতে পাই দেবতার উদ্দেশ্যে বস্তু বন্ধনের কথা। গুজরাটের মানুষেরা এই দিনে শুদ্ধ বস্ত্র ও কুশ একসঙ্গে গিঁট দিয়ে বেঁধে তা ঘি দুধ দই গোমূত্র ও গোময় অর্থাৎ 'পঞ্চগব্য' মিশ্রণে ভিজিয়ে জড়িয়ে দেন শিবের লিঙ্গমূর্তিতে বা অন্য দেবতার শরীরে। রাখির সঙ্গে এই কৃত্যের কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। দক্ষিণ ভারতের ধীবর সম্প্রদায় এই দিন পালন করেন 'নারিয়েল পূর্ণিমা' রূপে। জলযানকে রক্ষার জন্য এই দিনে ফুলমালা সহযোগে সাজানো হয়। যানকে রক্ষার জন্য বেঁধে দেওয়া হয় দেবতার পায়ে ঠেকানো সূত্র। সমুদ্রে ভাসানো হয় নারকেল। নাচেগানে পালিত হয় এই উৎসব। সুতরাং রাখিবন্ধন বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন রূপে সারা দেশেই প্রচলিত।

দক্ষিণ ভারতের ধীবর সম্প্রদায়ের রাখিবন্ধন জলযান রক্ষার জন্য 'নারিয়াল' পূর্ণিমা।

নেত্রদান মহাদান

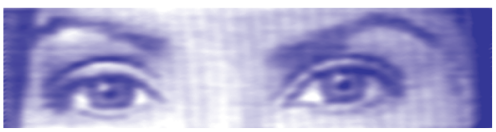

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

রাখিবন্ধন ও জাতীয় সংহতি

অতুল কুমার বিশ্বাস

সংস্কৃত শব্দ 'রক্ষাবন্ধন' থেকে রাখিবন্ধন শব্দের উৎপত্তি। কথিত আছে, স্বর্গের অধিকার নিয়ে দেবতা ও দানবদের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। দেবসেনাপতি দানবদের হাতে পরাজিত হচ্ছেন। দেবরাজ ইন্দ্র নিজে যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করে তাঁর নামে রঙিন সুতো দেবরাজ ইন্দ্রের হাতে বেঁধে দিয়ে তাঁর সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। অনেকের ধারণা, এখান থেকেই রাখির উৎপত্তি। মহাভারতে দেখা যায় যে, মাতা কুন্তী তাঁর সদ্যোজাত পুত্রকে রাখি বেঁধে জলে ভাসিয়ে দিলেন, আর সেই পুত্র পরবর্তীকালে বীরত্ব ও রাজত্ব লাভ করল। এক্ষেত্রে মায়ের রক্ষাসূত্র পুত্রকে রক্ষা করল। সীতাদেবীর সন্তান জন্মাবার পর মহর্ষি বাল্মীকি শিশুর হাতে মন্ত্রপূত কুশ পরিয়ে দিয়ে তাঁদের রক্ষাবন্ধন করালেন এবং নামকরণ করলেন যথাক্রমে কুশ ও লব। মাতা যশোদাও শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণ কামনায় রক্ষাবন্ধন করেছিলেন। আজও মায়েরা বিপত্তারিণী ব্রত করে ছেলেমেয়েদের হাতে আশীর্বাদপূত তাগা বেঁধে দেন সন্তানদের মঙ্গল কামনায়, এটিও রাখির নামান্তর মাত্র। শ্রাবণী পূর্ণিমায় রাখিবন্ধনের কথা বেদ সংহিতায় উল্লেখ আছে। দক্ষ বংশোৎপন্ন একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত রাজা শতানীকের মণিবন্ধে স্বর্ণিম রক্ষাসূত্র বন্ধন করে তাঁর মঙ্গল কামনা করেছিলেন। সমাজ সুরক্ষার জন্যে ভগবান বিষ্ণু বামন অবতার রূপে মহাবলশালী দানবরাজ বলিকে এই রক্ষাবন্ধন সূত্রেই আবদ্ধ করেছিলেন। আজও কোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে পুরোহিতগণ তাঁদের যজমানদের হাতে কুশের তৈরি বলয় পরিয়ে দিয়ে মঙ্গলকামনা করেন।

শুধুই পৌরাণিক নয়, ঐতিহাসিক দিক থেকেও রক্ষাবন্ধন সমাজে অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। পুরুর সঙ্গে আকেজান্ডারের যুদ্ধের সময় গ্রীক রাজমহিষী পুরুর হাতে রাখি বেঁধে দিয়েছিলেন স্বামীর সুরক্ষা কামনা করে। মোগল যুগে চিতোরের রাণী কর্ণাবতী গুজরাটের নবাব বাহাদুর শাহের দ্বারা আক্রান্ত হলে সাহায্য প্রার্থনা করে বাদশা হুমায়ুনের কাছে রাখি

পাঠিয়েছিলেন। বাদশা সঙ্গে সঙ্গে কর্ণাবতীকে বোন বলে স্বীকার করেন এবং বোনকে রক্ষার জন্য সুদূর বঙ্গদেশ থেকে চিতোর যাত্রা করেন। কিন্তু বাদশা চিতোরে পৌঁছবার আগেই সম্মান রক্ষার জন্য আক্রান্ত রাণী জহরব্রতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন।

প্রতি বছর শ্রাবণী পূর্ণিমায় ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে বোনেরা ভাইয়ের হাতে রাখি পরিয়ে ভাইয়ের মঙ্গলকামনা করে এবং ভাইয়েরাও বোনদের রক্ষার শপথ গ্রহণ করে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অকালে রাখিবন্ধন করেছিলেন জাতীয় সংহতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে। ১৯০৫ সালে বৃটিশ রাজশক্তি বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন করার জন্য সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি প্রয়োগ করে বাংলাকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে দুই ভাগে ভাগ করার চক্রান্ত করেছিল। সারা বাংলা জুড়ে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বাঙালি সমাজ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের দিনে রবীন্দ্রনাথ রাখি হাতে পথে নেমেছিলেন বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার সঙ্কল্প নিয়ে। সেদিন সকলের কণ্ঠে ছিল রবীন্দ্রনাথের লেখা গান—

'বাংলার মাটি, বাংলার জল
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক
হে ভগবান।।'

সেদিন বাংলায় এমন কোনো নগর, গ্রাম, জনপদ ছিল না সেখানে রাখিবন্ধন উৎসবের কোলাহল উঠেনি। এমন তরুণ ছিল না যে সেদিন দেশের কাজে উদাসীন ছিল। সমস্ত বাঙালিজাতি পরস্পরের হাতে রাখি বেঁধে বাংলাকে অখণ্ড রাখার শপথ গ্রহণ করেছিল। রাখি যে একতাবদ্ধ করার ক্ষমতা রাখে তা সেদিন ভারতবাসী প্রত্যক্ষ করেছিল। ফলস্বরূপ ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতির কাছে পরাজয় স্বীকার করে ১৯১১ সালে কার্জন বঙ্গভঙ্গ রদ করেন— দুই বাংলা আবার এক হয়েছিল।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ রাখিবন্ধন উৎসবটিকে একটি জাতীয় রূপ দিয়েছে। ভারতবাসীর মধ্যে একই সাংস্কৃতিক ধারা প্রবাহিত হলেও ভাষা-সম্প্রদায়-পন্থ ও কর্মগত শ্রেণীবিভাগের কারণে সমাজের মধ্যে একাত্মতার অভাব অনুভূত হচ্ছে। ফলে সমাজের মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদ ভাব, ঘৃণা ও পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতার প্রকাশ ঘটছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ রাখিবন্ধন উৎসবের মাধ্যমে সমাজের সমস্ত ভেদভাব দূর করে সমাজকে একসূত্রে আবদ্ধ করে জাতীয় ঐক্যকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

বর্তমানে দেশের ছোট-বড় বহু সংগঠনই রাখি উৎসবকে সামনে রেখে দেশবাসীর মধ্যে ভেদাভেদ ও অনৈক্যকে দূর করে দেশকে শক্তিশালী করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে রাখিবন্ধন উৎসব চিরাচরিত শাস্ত্রীয় বোন-ভাই-এর মধ্যে সীমিত না থেকে সমাজের সর্বস্তরে মানুষে মানুষে ভাব বিনিময়, জাতীয় সংহতি ও সম্প্রীতির মেলবন্ধন স্থাপনের মাধ্যম হিসাবে কাজ করছে। রাখিবন্ধনের পুণ্য তিথিতে সমগ্র ভারতবাসী ভারতের জাতীয় ও সামাজিক সংহতি রক্ষায় এক সঙ্কল্পসূত্রে গ্রথিত হোক— এই প্রার্থনা। ■

থাকে যদি
ডাটা,
জমে যায় রান্নাটা

ডাটা®

গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়

কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী)
প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন

pure INDIAN SPICES

Krishna Chandra Dutta (Cookme) Pvt. Ltd.

207 Maharshi Debendra Road,
Kolkata 700007
email : dutaspice@gmail.com

চিঠিপত্র

তসলিমা নাসরিন

বাংলাদেশের নির্বাসিত মৌলবাদী-বিরোধী প্রতিবাদী লেখিকা তসলিমা নাসরিন ১৯৯৪ সাল থেকে নিজের মাতৃভূমি বাংলাদেশ ছাড়া। দীর্ঘ ২০ বছর তিনি সুইডেন, ফ্রান্স, জার্মানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতে নির্বাসিতের জীবনযাপন করে চলেছেন। তিনি এখন তাঁর মাতৃভূমি বাংলাদেশে ফিরতে চান। আসতে চান পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা শহরে। কিন্তু তসলিমা নাসরিনের বাংলাদেশ ফিরতে সাহায্যের হাত বাড়াতে প্রস্তুত নন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তসলিমা বাংলাদেশে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। খালেদা জিয়া থেকে শেখ হাসিনা কেউই তাঁকে দেশে ফিরতে সহযোগিতা করতে রাজি হননি। বাংলাদেশে ধর্মান্ধ মৌলবাদী ও পাকিস্তান-পন্থীদের টার্গেট তসলিমা নাসরিন। ২০০৮ সালে কলকাতা শহরে তাঁর এক বিতর্কিত লেখাকে কেন্দ্র করে ধর্মান্ধ মুসলমান মৌলবাদীদের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে কলকাতা শহরে সেনা ডাকতে হয়েছিল সিপিএমের নেতৃত্বাধীন পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের তরফে। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বিমানে তাঁকে কলকাতা থেকে জয়পুরে পাঠিয়ে দেন। দীর্ঘ ৬ বছর কলকাতা ছাড়া। তসলিমা নাসরিনের দ্বিতীয় মাতৃভূমি অবশ্যই এপার বাংলা পশ্চিমবঙ্গ। কলকাতার ধর্মান্ধ মুসলমান মৌলবাদীদের বিক্ষোভকে মদত দিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দলের বর্তমান সাংসদ ইদ্রিশ আলি, মমতাঘনিষ্ঠ টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম আব্দুল রহমান বরকতি প্রমুখ তসলিমার বহিষ্কারের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দক্ষিণ ও মধ্য কলকাতার বিস্তীর্ণ অঞ্চল অবরোধ করে। ২০০৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের পরাজয় ও ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভের পর বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝিয়ে দেন যে, তাঁর পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবাদী লেখিকা তসলিমা নাসরিন ব্রাত্য থাকবেন। তসলিমা প্রশ্নে সিপিএমের বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বিমান বসু বা কংগ্রেসের অধীর চৌধুরী, সোমেন মিত্ররা মমতার পথ ধরেই তাঁকে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকতে দেওয়ার ঘোর বিরোধী। একমাত্র বিজেপিই তসলিমাকে কলকাতা থেকে বহিষ্কারের প্রতিবাদে সরব হয়।

ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর তসলিমা নাসরিন নতুন করে আশায় বুক বাঁধছেন যে, তাঁর মাতৃভূমিতে ফেরার ক্ষেত্রে মোদী সরকার সহায়ক ভূমিকা পালন করবেন। তসলিমা নাসরিন বাংলাদেশে পাসপোর্ট রিনিউ করার জন্য বারবার নয়া দিল্লীর বাংলাদেশ দূতাবাসে গেলেও প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। ঢাকা থেকে কোনো সবুজ সঙ্কেত নেই তাই তসলিমার পাসপোর্ট পুনর্নবীকরণ করা হয়ে ওঠেনি।

তসলিমা নাসরিন বাংলাদেশে ফেরার আশায় বুক বাঁধলেও তা বাস্তবায়িত হবে কিনা সন্দিগ্ধ পর্যবেক্ষক মহল। একইভাবে তাঁর অঘোষিত দ্বিতীয় মাতৃভূমি পশ্চিমবঙ্গেও যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে ঢুকতে দেবেন না তাতে নিজেও তিনি বিস্মিত। তাঁর ইস্যুতে তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম সকলেই একজোট বলেই মনে করছেন তসলিমা নাসরিন। অথচ তাঁকে কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গে ঢুকতে না দেওয়া নিয়ে তথাকথিত পরিবর্তপন্থী তথা ক্ষমতাপন্থী শিল্পী- বুদ্ধিজীবীদের পাশে সিপিএমের সাংস্কৃতিক জগতের লোকজন, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীদের তসলিম-বিরোধিতা দেখে ক্ষুব্ধ এপার বাংলার বহু নাগরিক। ধর্মান্ধ মসুলমান মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালানোয় খেসারত দিতে হচ্ছে তসলিমা নাসরিনকে। ভারতের রাজনৈতিক সমীকরণে তসলিমা নাসরিন নরেন্দ্র মোদীকে মোটেই সাম্প্রদায়িক মনে করেন না। বরং তথাকথিত সেকুলারবাদী অনেক দলের নেতা-নেত্রীই মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে গাঁটছাড়া বেঁধে চলেন বলেই তাঁর অনুযোগ। তাঁর আশা, মোদী সরকার তাঁকে তাঁর মাতৃভূমি বাংলাদেশে ফিরতে সাহায্যের হাত বাড়াবেন এবং এ বিষয়ে শেখ হাসিনা সরকারের সঙ্গে কথা বলবেন। নয়াদিল্লীতে ঘনিষ্ঠ মহল তসলিমা নাসরিনের এই প্রত্যয়ই ব্যক্ত করেন।

—**দিলীপ চট্টোপাধ্যায়,**
কাশীপুর, কলকাতা-২।

নারী নির্যাতনে মেয়েরা

সমগ্র ভারত এবং বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে যে ভয়ানক ভাবে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ বেড়ে চলেছে তার জন্য আজকের মেয়েদের ভূমিকা অনেকাংশে রয়েছে। চারদিকে তাকিয়ে দেখলেই দেখা যায় মেয়েরা আজকাল অল্পবয়স থেকেই লজ্জাস্থান প্রায় আঢাকা করে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করে গর্ববোধ করছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে শরীরের গঠনের পরিবর্তনের ফলে টাইট জামা-কাপড়ের দৌলতে লজ্জার স্থানগুলির প্রকট কুৎসিতভাবে দৃশ্যমান হচ্ছে। যৌবন প্রাপ্ত পুরুষ ছাড়াও বৃদ্ধদের চোখেও যা অস্বস্তির কারণ হচ্ছে।

এই ব্যাপারে কোনো মহল থেকে কথা বললেই বলা হচ্ছে ১৮ বছরের পরে মেয়েরা কি পোশাক পরবে তা তার ব্যক্তিগত পছন্দ। আমরা এতদিন জানতাম 'আপরুচিখানা আর পররুচি পরনা'। কিন্তু এখন দেখছি তথাকথিত কিছু প্রগতিশীল মেয়েদের পোশাক সম্বন্ধে কোনো কথা বললেই হৈচৈ বাঁধান, অথচ সরকার আবগারি শুল্কের আদায় বৃদ্ধির জন্য পাড়ায় পাড়ায় যথেষ্ট মদ বিক্রির অনুমতি দিলেও চুপ করে থাকে আর প্রতিবাদী চরিত্রদের

‘সৌরভে’র পরিণতি ঘটে।

আচ্ছা ব্রাজিলে কোপাকাবানা বিচে যে পোশাকে মেয়েরা ভলি/ফুটবল খেলে, এদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সেটা কি অসম্ভব নয়? এদেশে বেশ কিছু নারী অর্থের লোভে নগ্ন ছবি ছাপাচ্ছে যা বিভিন্ন ম্যাগাজিনে বেরোচ্ছে। এটা কি বন্ধ হওয়া উচিত নয়?

এই সমস্ত কথাবার্তাকে মৌলবাদী আখ্যা না দিয়ে বরং মা-বাবাদের উচিত বাস্তববাদী হওয়া। বিভিন্ন দৈনিকে যে সংখ্যায় ‘ফ্রেন্ডশিপ’ এবং ‘হার্বাল থেরাপির’ বিজ্ঞাপন বের হচ্ছে তাতে অনেক মা-বাবা হয়তো নিজের মেয়েকে ওইসব পেশায় প্রতিষ্ঠিত দেখতে আগ্রহী এবং যতটা খোলামেলা সম্ভব পোশাক পরিয়ে শিক্ষানবিশির পাঠ দেন।

—শরৎ সরকার,
শিবপুর, হাওড়া।

তাপস পালেরা ক্ষমার অযোগ্য

কোনো সভ্যদেশের, সভ্য সমাজের সুস্থ মানুষ তাপস পালের বক্তৃতাকে সমর্থন করতে পারেন না। তিনি যে ভাষায় বিরোধীদের আক্রমণ করেছেন সেটা অত্যন্ত নিম্নরুচির ও নিতান্ত ম্লেচ্ছদের ভাষা। তিনি যেভাবে দলীয় কর্মীদের অন্যায় কাজে প্ররোচিত করেছেন তাতে তাঁর বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ সরকারের আইনি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল। দলনেত্রী হিসেবে তৃণমূল সুপ্রিমো— তাপস পালের বীরত্বকে প্রশংসা করতেই পারেন বা ভ্রাতৃস্নেহে ক্ষমা করে দিতেই পারেন কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী এবং পুলিশমন্ত্রী হিসেবে তিনি কী কর্তব্য পালন করলেন--- সেটা অবশ্যই গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তাৎপর্যপূর্ণ!

তাপস পাল প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন তিনি একজন সেই ‘মাল’ (রংবাজ) এবং ‘মাল’ (পিস্তল) নিয়ে ঘোরেন। তার নিজের রিভলবার দিয়ে বিরোধীদের গুলি করে মারবেন। তাপস পালের কি লাইসেন্স প্রাপ্ত রিভলবার আছে? থাকলেই বা কি ভারত সরকার তাকে প্রকাশ্য দিবালোকে যথেচ্ছগুলি করবার অনুমতি দিয়েছে? যদি না দিয়ে থাকে তবে তাকে ‘Attempt to murder case’-এ গ্রেপ্তার করা হলো না কেন?

শুধু তাপস পাল-ই নয়। তাপস পালের বক্তব্য মিডিয়ায় আসার পর পরই বাঁকুড়ার সভাধিপতি অরূপ চক্রবর্তীর বক্তব্যে বাংলার মানুষ রীতিমতো স্তম্ভিত, ভীত ও সন্ত্রস্ত। তিনি দলীয় কর্মীদের ডেকে বললেন, ‘‘অ্যাই শোন, তোদের বাড়িতে যদি কোনো নেতা ঢোকে, কেটে দিবি। আমি বুঝে নেব। তোদের ঘরে যদি বাইরের কেউ ঢোকে, বলিদান করে দিবি। আমি বুঝে নেব। যা।’’ কী সাংঘাতিক কথাবার্তা! অরূপ চক্রবর্তীই-বা কেন গ্রেপ্তার হলেন না!

বাংলার রাজনীতিতে মানুষের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। প্রতিটি জেলায়, মহকুমায়, ব্লকস্তরে জন্ম নিচ্ছে অসংখ্য তাপস পাল, অরূপ চক্রবর্তী, আরাবুল, মণিরুল, অনুব্রত মণ্ডল। এদের মতো মানুষের হাতে ক্ষমতা থাকলে বাংলার ঘরে ঘরে আগুন জ্বলে উঠবে, কু-কার্যে উদ্বুদ্ধ হবে মস্তান-মাফিয়া প্রমোটার-সমাজ বিরোধীর দল। অন্যদিকে পল্লিগাঁয়ের মা-বোন ও সাধারণ মানুষের আর্ত কান্নায় আর্দ্র হয়ে উঠবে বাংলার আকাশ, বাংলার মাটি।

—অশোক কুমার ঠাকুর,
কোচবিহার।

পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা ড. শ্যামাপ্রসাদ

স্বস্তিকায় ২২ আষাঢ়, ১৪২১ সংখ্যায় প্রচ্ছদপটে পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা ড. শ্যামাপ্রসাদের যে রঙীন ছবিটি প্রকাশিত হয়েছে তাঁতে তাঁর ব্যক্তিত্ব উজ্জ্বলভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। ছবিটি বাঁধিয়ে আমার ড্রয়িং রুমে রেখে দিয়েছি।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ না করে পারছি না যে পশ্চিমবঙ্গের এই মহান স্রষ্টার প্রতি এখানকার সব বাম-ডান তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাজ নৈতিক নেতা-নেত্রীদের তাচ্ছিল্যের মনোভাব পোষণ করা। তাঁরা সব ‘ধর্মনিরেপক্ষতার’ নামাবলি গায়ে দিয়ে এই মহান নেতাকে সাম্প্রদায়িক বলে গালি দিচ্ছেন। আজ কোথায় থাকত তাঁদের এই বাগাড়ম্বর, নেহরু যখন গোটা বাংলাকে জিন্না তথা মুসলিম লীগকে উপহার দিতে উদ্যত তখন ড. শ্যামাপ্রসাদ এই সর্বনাশা উদ্যোগের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের কবল থেকে এই পশ্চিমবঙ্গকে যদি ছিনিয়ে না আনতেন? তাই তিনি নেহরুর দিকে আঙুল তুলে বলতে পেরেছিলেন ‘‘You divided India, but I divided Pakistan’’। গোটা বাংলাকে পাকিস্তান বানাবার নেহরু ও জিন্নার এই পরিকল্পনা সফল হলে আজ পশ্চিমবাংলায় যাঁরা বীর বিক্রমে রাজত্ব করছেন তাঁদের ‘ধর্মনিরপেক্ষতার’ চর্চা করার জন্য দণ্ডকারণ্য, আন্দামান ও তরদির জঙ্গলে যে পালাতে হোত তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

—সুহাস বসু,
বেহালা, কলকাতা-৬০।

সবার প্রিয়
®
বিল্লদা
চানাচুর
‘বিল্লদাকুঞ্জ’
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ /
৯২৩৩১৮৯১৭৯

পর্ব-২৭

শ্রীচৈতন্য পরবর্তী নতুন ধারার মন্দির

বাংলার মন্দিরে মন্দিরে

কেদার ভুড়ভুড়ির দেউল

ড. প্রণব রায়

গিরিমোহান্তদের বেলদা থানার অন্তর্গত কেদারগ্রামে 'ভুড়ভুড়ি' দেউল ওড়িশী রীতির একটি খাঁটি 'রেখ' বা 'শিখর' দেউল। খড়্গপুর কাঁথি পাকা রাস্তায় সাউরি থেকে প্রায় এক কিলোমিটার পশ্চিমে কেদার গ্রামটি অবস্থিত। এই মন্দিরের শিবলিঙ্গ গর্ভগৃহের 'গম্ভীরা'র জলে নিমজ্জিত এবং প্রায়ই জলে ভুড়্ভুড় শব্দ ওঠায় এই শিব 'কেদার ভুড়ভুড়ি' নামে পরিচিত। পশ্চিম মেদিনীপুরের অন্তর্গত ডেবরা থানায় কেদার গ্রামের মেলাডাঙায় চপলেশ্বর শিবও গম্ভীরার জলে নিমজ্জিত, সেই জল থেকে ভুড়ভুড় শব্দ হওয়ায় এটিও কেদার 'ভুড়ভুড়ি' শিব নামে পরিচিত। উক্ত দু'টি শিবের মন্দিরের পাশে দু'টি পুকুর বা দিঘি (যা কুণ্ড নামে পরিচিত) আছে। তার সঙ্গে মন্দিরের যোগ আছে। প্রতিনিয়ত সেখান থেকে 'ভুড়ভুড়' শব্দ ওঠে।

পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এই দুই জেলায় একই নামের গ্রামে শিবের গম্ভীরার জলের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী পুকুর বা কুণ্ডের যোগের ফলে যে ভুড়ভুড় আওয়াজ হয়, তা থেকেই শিবের নাম 'কেদার ভুড়ভুড়ি'।

কিন্তু মন্দিরস্থাপত্যের ক্ষেত্রে ডেবরা থানার কেদারের চপলেশ্বর শিবের মন্দিরের চেয়ে বেলদা থানার মন্দির স্থাপনের ওড়িশী রীতির 'রেখ'-শৈলীর প্রয়োগ অনেক বেশি ও প্রায় নিখুঁত ওড়িশী রেখ-শৈলীর মন্দিরগুলির মতো এটিও সুদৃশ্য। এই মন্দির ভালো করে লক্ষ্য করলে এমনটা মনে হয়, ওড়িশার 'রেখ' দেউল মন্দির এই অঞ্চলে কতটা জনপ্রিয় ছিল। এক সময় এই সব অঞ্চল তো ওড়িশারই অন্তর্গত ছিল— সেই খৃস্টীয় একাদশ শতক থেকে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতক পর্যন্ত। সুদীর্ঘকাল ওড়িশার অন্তর্ভুক্ত থাকায় ওড়িশী শিল্প ও সংস্কৃতি এই অঞ্চলে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে, যার ফলশ্রুতি এইসব মন্দির। ভাষা, শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মেদিনীপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল যে ওড়িশার প্রভাব-মণ্ডলের মধ্যে ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শিব ও জগন্নাথ উপাসনা এই অঞ্চলে সর্বাধিক। মন্দিরগুলির দেববিগ্রহও এই দুই দেবতার।

কেদার গ্রামের কেদার ভুড়ভুড়ির 'রেখ'-দেউল মাকুড়া পাথরে তৈরি। পশ্চিমমুখী এই দেউল মন্দিরটির সঙ্গে ক্ষুদ্রাকৃতি একটি 'জগমোহন'ও যুক্ত হয়েছে। দেউলের উচ্চতা প্রায় ৪০ ফুট এবং দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ১৩ ফুট ১১ ইঞ্চি। জগমোহন দৈর্ঘ্য-প্রস্থে যথাক্রমে ৬ ফুট ৫ ইঞ্চি ও ৩ ফুট ৫ ইঞ্চি। মূল মন্দিরের ('বিমান') চারদিকের দেওয়ালে প্রতিকৃর্তি ভদ্ররীতির দেউল তিন থাকযুক্ত দেখা যায়।

মূল দেউলের 'পঞ্চাঙ্গ রায়', 'গণ্ডী' ও 'শীর্ষ'— ওড়িশী রীতির দেউলের এই তিনটি প্রধান অংশ সুস্পষ্ট। শীর্ষে বৃহৎ 'অমলঞ্চ', ঘণ্টা, কলস ও ত্রিশূল বর্তমান। 'বরণ্ডি'র ওপরে চারদিকে চারটি 'ঝাপ্পা সিংহ' (Rampant lion) লক্ষ্য করা যায়।

এই মন্দিরে ভাস্কর্যের মধ্যে জগমোহন— প্রবেশ পথের ওপর লিন্টেলে (কড়ি বা বরগা) নবগ্রহমূর্তি খোদিত। মূর্তিগুলির ভাস্কর্যশৈলী উচ্চমানের।

এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল জ্ঞাপক কোনো লিপি নেই। তবে মন্দিরটি নিঃসন্দেহে যে একটি প্রাচীন মন্দির, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

চিরায়ত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থাবলী

কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেন ও উপেন্দ্রনাথ সেন কৃত
আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ (চারখণ্ডে) ১০০০
সংস্কৃত মূলপাঠ ও টীকাসহ সরল বঙ্গানুবাদে
কবিরাজ অমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ বিরচিত
আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা (চারখণ্ডে) ৮০০

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
প্রাচীন ভারতের আয়ুর্ব্বেদ ও রসায়ন চিন্তা ৩০০

মহর্ষি সুশ্রুত বিরচিত
সুশ্রুত সংহিতা (চারখণ্ডে) ৮০০
মহর্ষি শার্ঙ্গধর বিরচিত
শার্ঙ্গধর ঃ চিকিৎসা সংগ্রহ ১৭৫
শ্রীচক্রপাণি দত্ত বিরচিত চক্রদত্ত ২২০
শ্রী রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ বিরচিত
আয়ুর্ব্বেদ সোপান ১০০
মহামতি শ্রীমৎ মাধবকর বিরচিত নিদান ৩৫০
(রোগবিজ্ঞান, রোগনির্ণয়-সংগ্রহ ও নাড়ীজ্ঞান রহস্য গ্রন্থ তিনটি সংযোজিত)
শ্রীমৎ রাখাল দত্ত কবিরাজ বিরচিত
আয়ুর্ব্বেদীয় ফলিত চিকিৎসাবিধান ২৭৫
মহর্ষি বাগভট অষ্টাঙ্গহৃদয় (দুইখণ্ডে) ৪০০
মহামুনি কণাদ বিরচিত
নাড়ীবিজ্ঞান ও নাড়ীপ্রকাশ ৭৫
আচার্য ভাবমিশ্র বিরচিত
ভাবপ্রকাশ (চার খণ্ডে) ১২০০
আচার্য গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য বিরচিত
রসেন্দ্রসার সংগ্রহ ২০০
মহর্ষি বাগভট বিরচিত
রসরত্নসমুচ্চয় (দুই খণ্ডে) ৬০০
(রসরহস্য বিজ্ঞানম ও পরিভাষা প্রদীপ গ্রন্থ দুইটি সংযোজিত)
অধ্যক্ষ সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন কৃত
কায়চিকিৎসা ২৫০
ভিষগ্বর গোবিন্দদাস বিশারদ বিরচিত
ভৈষজ্য রত্নাবলী (তিনখণ্ডে) ৭০০
অধ্যাপক আশীষকুমার মল্লিক
আয়ুর্ব্বেদ সিদ্ধান্ত ঃ দর্শন ও পদার্থসূত্র ২২৫
আয়ুর্ব্বেদ সংকলন ২২৫
(শারীরবিজ্ঞান, বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মা, আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস, সহজ রোগনির্ণয়)

সদ্য প্রকাশিত নতুন সংস্করণ

মহর্ষি চরক বিরচিত
চরক সংহিতা (প্রথম খণ্ড) ৩৫০
সূত্রস্থান।। নিদানস্থান।। বিমানস্থান।।
চরক সংহিতা (দ্বিতীয় খণ্ড) ৪০০
শারীরস্থান।। ইন্দ্রিয়স্থান।। চিকিৎসিত স্থান।। (প্রথমাংশ)
চরক সংহিতা (তৃতীয় খণ্ড) ৩৫০
চিকিৎসিত স্থান (শেষাংশ)।। সিদ্ধিস্থান।। কল্পস্থান।।

দীপায়ন
২০, কেশব সেন স্ট্রিট, কল-৯
☎ ২২৪১-৪১৫০
E-mail : deepayan07@gmail.com

বিলুপ্ত বিদ্যা
যক্ষিণীসাধনা

নবকুমার ভট্টাচার্য

সুপ্রাচীনকালে আমাদের দেশে এমন অনেক বিদ্যা ছিল যা বর্তমানে বিলুপ্ত হয়েছে। এই বিষয়ে গ্রন্থও বিলুপ্ত হয়েছে, বহু অনুসন্ধানেও এই বিদ্যার একটি পুঁথিও পাওয়া যায়নি। হয়তো কোনো কোনো তান্ত্রিক যোগীর নিকট একটি জীর্ণ পুঁথি রয়েছে কিন্তু তাঁরা প্রাণান্তেও এই গ্রন্থ কাউকে দেখতে অথবা শিক্ষা দিতে চান না। কারণ এই শাস্ত্র শিখে আজ পরোপকারের চেয়ে অনিষ্ট ঘটাতে সবাই বেশি আগ্রহী হচ্ছেন। আবার প্রক্রিয়া মতো সাধনা না হওয়ায় স্বয়ং ক্ষতিরও সম্মুখীন হয়েছেন অনেকে। তাই সমাজ থেকে বিদ্যাটাই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। একশত বৎসর পূর্বের যক্ষিণীবিদ্যা তেমনই এক বিদ্যা যা আজ বিলুপ্ত। প্রায় পঁচিশ তিরিশ বছর পূর্বে কাশীর সংস্কৃত কলেজের সরস্বতী ভবন লাইব্রেরিতে যক্ষিণীবিদ্যার একটি জীর্ণ পুঁথি চোখে পড়েছিল। পরে সে পুঁথিরও আর খোঁজ মেলেনি। প্রয়াত পুঁথি বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিত অনন্তলাল ঠাকুর বিহারের দ্বারভাঙা জেলায় যক্ষিণীসাধনার প্রচলনের কথা বলেছিলেন, কিন্তু তিনিও কোনো পুঁথির সন্ধান দিতে পারেননি। নর্মদা পরিক্রমাকালে জব্বলপুরে পণ্ডিত বেদপ্রকাশ উপাধ্যায়ের কাছে যক্ষিণীসাধনা সম্বন্ধে কিছু ধারণা পেয়েছিলাম মাত্র। তিনি তালপাতায় লাল কালিতে হাতেলেখা তিব্বতি ভাষায় একটি পুঁথি দেখিয়ে বলেছিলেন এতে যক্ষিণী সাধনার কিছু সূত্র রয়েছে মাত্র কিন্তু সম্পূর্ণ পদ্ধতি তিনি পাননি। এই পুঁথির তথ্য সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, যক্ষিণী সাধনা একান্ত গুরুমুখী। নিজে নিজে এই বিদ্যা রপ্ত করা যায় না। সাধনার পথও বেশ কঠিন। সামান্য বেনিয়ম হলেই নাকি বিপত্তি ঘটে। যক্ষিণীসাধনা আসলে কি? ভূতডামর তন্ত্রে বলা হয়েছে— যক্ষিণীসাধনা অতিগুহ্য এবং দেবগণেরও দুর্লভা। যক্ষিণীসাধনা করেই কুবের ধনাধিপতি হয়েছেন। এই সাধনা করলে মানুষ রাজত্ব লাভ করতে পারবে। যক্ষিণীকে মাতা, ভগিনী বা ভার্যা রূপে সাধনা করা যায়। মাতৃভাবে সাধনা করলে যক্ষিণী অর্থ ও মনোহর দ্রব্য প্রদান করেন, রাজত্ব পর্যন্ত দেন। সাধককে পুত্রবৎ পালন করেন। ভগিনীরূপে আরাধনা করলে যক্ষিণী নানাবিধ দ্রব্য ও দিব্যবস্ত্র প্রদান করেন। সাধক যক্ষিণী সকাশে যা কিছু প্রার্থনা করে যক্ষিণী তৎক্ষণাৎ তা প্রদান করেন। আর ভার্যারূপে উপাসনা করলে সাধক সংসারে সর্বরাজপ্রধান হন এবং ভূত, ভবিষ্যৎ-বর্তমান ঘটিত সকল ঘটনা যক্ষিণী সাধককে জানিয়ে থাকেন।

যক্ষিণী যে সমস্ত বস্তু প্রদান করেন তা অনির্বচনীয়। তবে ভার্যারূপে সাধনা করলে সাধক যদি অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত হন তবে যক্ষিণী রুষ্ট হয়ে সাধককে বিনাশ করেন। তিব্বতি ভাষার পুঁথিতে যক্ষিণী আরাধনায় যক্ষিণীর যে ধ্যান রয়েছে—

'কুরঙ্গনেত্রাং শরদিন্দুবক্ত্রাং বিম্বধরাং চন্দনগন্ধলিপ্তাম্।

চীনাংশুকাং পীনকুচাং মনোজ্ঞাং শ্যামাং সদা কামদুঘাং বিচিত্রাম্।'

অর্থাৎ যক্ষিণীর নেত্র মৃগনেত্রের ন্যায় সুদৃশ্য, মুখ শরৎকালের শশধরের ন্যায় সুশোভন। অধর বিল্বফলের ন্যায় অরুণবর্ণ। সর্বাঙ্গ সুগন্ধ চন্দনে অনুলিপ্ত। পরিধেয় চীনবস্ত্র ও স্তনদ্বয় অতি স্থূল। ইনি রমণীয় মূর্তিমতী, অদ্ভুতরূপশালিনী ও শ্যামবর্ণা। ইনি কামধেনুর ন্যায় সাধকের সর্বকামনা পূর্ণ করেন এবং বিচিত্রবর্ণা।

কাশীর পুঁথিতে এই আরাধনা প্রসঙ্গে যা রয়েছে— চন্দন দিয়ে মণ্ডপ নির্মাণ করে সেখানে যক্ষিণীর মন্ত্র লিখে ধ্যান পুজো ও জপ করতে হবে। 'ওঁ হ্রীং আগচ্ছ মনোহরে স্বাহা' এই মন্ত্র প্রতিদিন অযুত জপ করতে হয়। একমাস জপান্তে মাসান্তদিনে সমস্ত দিন জপ করতে হয় তারপর নাকি নিশাকালে যক্ষিণী কোনো রূপে সাধককে দর্শন দেন। একমাত্র পূর্ণাভিষিক্ত সাধকই এই সাধনার অধিকারী হন।

বর্তমানে এই সাধনার কোনো গ্রন্থ না থাকায় এই বিদ্যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তন্ত্রসার গ্রন্থে যক্ষিণী সাধনার কোনো বিবরণ নেই। ভূতডামরতন্ত্রে এই বিদ্যার উল্লেখ রয়েছে মাত্র। মহাচীন তন্ত্রে যক্ষিণী বিদ্যার ইতিহাস রয়েছে বলে শোনা যায়, কিন্তু মহাচীন তন্ত্র তিব্বতি ভাষায় লিখিত। বর্তমানে মহাচীন তন্ত্রের কোনো পুঁথি রয়েছে বলে জানা নেই। তবে আজকের ইন্টারনেটের যুগে এই বিদ্যা বিশ্বাসযোগ্য কিনা তাও সন্দেহের বিষয়।

মানবপ্রেমিক শ্রীশ্রী অন্নদাঠাকুর

মধুসুদন মুখোপাধ্যায়

যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্বপ্নাদেশে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বিশ্ববাসীকে একত্রিত করার উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীঅন্নদাঠাকুর প্রতিষ্ঠা করে গেছেন দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ আদ্যাপীঠ। তিনি বলতেন, আমরা একই মায়ের সন্তান, তাই প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্যের নামের পাশের যেন 'ভাই' শব্দটি থাকে। সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে, ধর্মে ধর্মে বিভেদ দূর করতে মন্দিরের চূড়ায় বসিয়ে গেছেন সকল ধর্মের ধর্মীয় প্রতীক। অর্থাৎ হিন্দুধর্মের ত্রিশূল, মুসলমান ধর্মের চাঁদতারা, খৃস্টান ধর্মের ক্রুশ, বৌদ্ধ ধর্মের হাতপাখা।

বাংলাদেশের চট্টগ্রামের রাউজান থানার উত্তর গুজরা গ্রামে শ্রীশ্রীঅন্নদাঠাকুর ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ৭ অগ্রহায়ণ রবিবার, ইংরাজি ১৮৯১, ২২ নভেম্বর কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম অভয়াচরণ ভট্টাচার্য, মাতা তিলোত্তমা দেবী, মায়ের আদেশে নিজের অভিজ্ঞতায় আবিষ্কার করেছিলেন ৬/৭ রকমের ব্যাধির ঔষধ। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে সারা দেশ জুড়ে তাঁর খ্যাতি।

১৩২২ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ ১০০নং আমহার্স্ট স্ট্রিটে হাজার হাজার টাকা খরচ করে চিকিৎসালয়ের উদ্বোধনের দিন স্থির হয়। কিন্তু তার কয়েকদিন পূর্বে বাসন্তী সপ্তমীর রাতে ঘটে যায় এক অলৌকিক ঘটনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব স্বপ্নে নির্দেশ দেন কলকাতা ইডেন গার্ডেনের জলাশয় থেকে জগজ্জননী আদ্যামাকে তুলে আনতে, সঙ্গে নিতে বললেন তিনজন পরমভক্ত, যথাক্রমে সত্যকিঙ্কর রায়, শচীন বসু এবং শচীন মজুমদারকে। রামনবমীর পুণ্যপ্রভাতে জ্যোতির্ময়ী আদ্যামাকে জলাশয় থেকে তুলে আনা হয়। অন্নদাঠাকুরের জীবনের গতি হয় পরিবর্তিত। চিকিৎসা করার বাসনা মন থেকে মুছে ফেলে শুরু হয় মাতৃসাধনা। বাসন্তী নবমীর রাত্রিতে আদ্যামা স্বয়ং নির্দেশ দেন, আমি এক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকব না। সকল ভক্তের ঘরে ঘরে পূজা পেতে চাই। আমি যে কেবল শাস্ত্রবিহিত মতেই পুজা পেতে চাই, তা নয়। 'মা খাও, মা পর' ইত্যাদি প্রাণের ভাষায় সকল বস্তু নিবেদন করে ব্যবহার করলেও আমার পুজা হবে। সরল প্রাণের প্রার্থনাই আমার উপাসনা। আর যদি কোনো ভক্ত আমার সম্মুখে আদ্যাস্তব পাঠ করে আমি বিশেষ আনন্দিত হই। সেই রাত্রিতে মা আরও বললেন— আগামীকাল বিজয়া দশমী, তুমি আমায় গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে এসো, বিসর্জনের কথায় অন্নদাঠাকুর পড়লেন জটিল সমস্যায়। হাজার হাজার টাকার প্রণামী এবং মিউজিয়াম থেকে সাহেবদের বহু অর্থের প্রতিদানে মূর্তি কিনে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি তাঁকে প্রলুব্ধ করতে পারেনি। দশমীর দিনে গঙ্গা-বক্ষে হলো মূর্তি বিসর্জন। বিসর্জনের পর থেকে অন্নদাঠাকুরের মানসিক অবস্থা হলো মাতৃহারা সন্তানের মতো। দিশেহারা, পথহারা, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এইভাবে দীর্ঘ চার বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের নির্দেশমতো অন্নদাঠাকুর ১৩২৫ বঙ্গাব্দের ঝুলন-পূর্ণিমার দিন হিমালয়ের পাদদেশে হৃষীকেশের স্বর্গাশ্রমে উপস্থিত হলেন। ওইদিন রাত্রেই পেলেন রামকৃষ্ণদেবের স্বপ্নাদেশ।

অন্নদাঠাকুর মানুষের মধ্যেই পেয়েছিলেন ঈশ্বরের দর্শন। তাঁর এই জীবসেবা দেখে রামকৃষ্ণদেব স্বপ্নাদেশে বলেন--- ''মানবমুক্তির জন্য তোমাকে বিশ বৎসর সাধনা করতে হবে। প্রথম দশ বৎসর চট্টগ্রামে গিয়ে পিতামাতার সেবা, বাকি দশ বৎসর সস্ত্রীক গঙ্গাতীরে মন্ত্রের পুরশ্চরণ। অর্থাৎ সাধনার দ্বারা মন্ত্রশক্তিকে জাগাতে হবে। এতে সিদ্ধিলাভ করলে তোমার উপর পড়বে একটি মন্দির নির্মাণের কঠিন দায়িত্ব। মন্দির নির্মিত হলে সারাদেশ এক ধর্মভাবের প্লাবনে প্লাবিত হবে। ঈশ্বর আছেন তা যুগে যুগে প্রমাণিত হবে।

তিনি জীবকে দেখা দেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায় যেমন আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি। অন্ততঃপক্ষে তিনজন ভাগ্যবান ভক্ত প্রতিবছর এই মন্দির থেকে প্রকট দর্শন পেয়ে জগতের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করবে। তাঁর আদেশ হলো, মন্দিরের ধনভাণ্ডার হতে পরিচালিত হবে কয়েকটি জনহিতকর কার্য। যেমন দুঃস্থ ও অনাথ ছেলেদের জন্য বালকাশ্রম, মেয়েদের জন্য বালিকাশ্রম, স্বামী পুত্রহীনা বিধবা মায়েদের জন্য মাতৃ আশ্রম, সংসার বিরাগী গৃহস্থদের জন্য বাণপ্রস্থ আশ্রম, সাধক ও সাধিকা আশ্রম এবং সংক্রামক ব্যাধি নিবারণের ব্যবস্থা।''

রামকৃষ্ণদেবের নির্দেশে মন্দিরের মধ্যে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হলো। এক বিচিত্রসমন্বয় ঘটিয়ে গুরু, কালী এবং হরি একই মন্দিরে যথাক্রমে রাধাকৃষ্ণ, আদ্যামা এবং জগদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়। জগদ্‌গুরুর নির্দেশে রাধাকৃষ্ণের ভোগ হয় সাড়ে বত্রিশ সের, আদ্যামায়ের সাড়ে বাইশ সের এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সাড়ে বারো সের চালের। এই ভোগের একটা অংশ প্রসাদ হিসাবে প্রতিদিন ৪০০/ ৫০০ দীনদুঃখী নরনারায়ণের সেবার বিতরণ করা হয়।

অন্নদাঠাকুর দীনদুঃখী নরনারায়ণের মধ্যেই দেখেছিলেন শিবকে। তিনি বিধবা অসহায় মায়েদের জন্য মাতৃ আশ্রম তৈরি করেছিলেন।

সঙ্ঘগুরু অন্নদাঠাকুর মহোদয়ের জীবনকাল মাত্র ৩৭ বৎসর। এই স্বল্পকালের জীবনে বিশ্ববাসীর জন্য খুলে দিয়ে গেছেন এক নতুন পথ।

তিনি বললেন, ''একটা কর্মযজ্ঞ খুলে দিয়ে গেলাম, লেগে থাকলে ধন্য হয়ে যাবি। এই প্রতিষ্ঠানের একটা ঘাস ছিঁড়ে যে দু'টুকরো করেছে তার জন্য অন্তিমে আমি আছি। আমার কাজ যে করে, আমি তার।''

চিরদিনের লেখা

ভয়কে ভাগাও

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

ভূত আছে কিনা বলতে পারি না, তবে ভূতের ভয় যে আছে এবং এই ভয় যে সত্যিকারের ভূতের চেয়েও মারাত্মক সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের দেশে বহুকাল থেকে ছোট ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়াবার জন্যে বা দুরন্ত ছোট ছেলে-পুলেদের শান্ত করবার জন্যে আমাদের অভিভাবকরা ভূতের ভয় দেখিয়ে থাকেন এবং সেইসঙ্গে বর্গী থেকে আঁই আঁই

বুড়ো পর্যন্ত নানারকমের বীভৎস জীবের চেহারা ছড়ায় গানে এবং পক্ষে তুলে ধরেন। আমাদের ঘরে যেদিন থেকে শিশু জন্মায়, সেইদিন থেকে তার সমস্ত শৈশবকে ঘিরে নানারকমের ভূত প্রেত আর অপদেবতা নানাভাবে আমাদের ঘিরে থাকে। সেইজন্যে শিশুর মাথার শিয়রে লোহা রাখা থেকে আরম্ভ করে আমাদের মা-বাবা আমাদের এমনভাবে কাছাকাছি রাখেন যে, আমাদের শৈশব চেতনা এক অজানা ভয়ের আতঙ্ক একেবারে ভিজে-ভিজে হয়ে যায়। আমাদের শিশুদের সাবধান করতে হলেই, আমরা নানারকম ভয়ের ছবি তাদের সামনে ধরি। আমাদের শৈশবে কোনো বড় গাছকে, কোনো ফাঁকা বাড়িকে, কোনো খালি ঘরকে, গাছ, বাড়ি বা ঘর হিসাবে দেখতে শিখি না। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের শৈশব জীবনের দিকে চেয়ে দেখলেই দেখতে পাবো, সেখানে একটা-না-একটা বৃহৎ বট, অশ্বত্থ বা নিম অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার ডাল থেকে ব্রহ্মদত্যিঠাকুর পৈতে গলায় খড়ম-সুদ্ধ পা ঝুলিয়ে বসে আছে। শৈশবে যখন আমাদের মন কাদার মতো নরম থাকে, তখন তাতে এই যে ভয়ের চিহ্ন দাগ কেটে বসে যায়, বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা আমাদের মনে নানারকম ভয়ের সৃষ্টি করে এবং লোকে না মানলেও, আমরা মনে মনে জানি, আমরা কতখানি ভীতু। সুতরাং দেখছো, শৈশবের এই সামান্য ব্যপারে যা অতি সাধারণ বলে কেউ ভ্রূক্ষেপই করে না, নিঃশব্দে আমাদের জাতের কতখানি ক্ষতি করে। আমাদের কত না কাপুরুষতার পেছনে, কত না পালিয়ে আসার পেছনে, কত না হেরে যাওয়ার পিছনে যে শৈশবের এই ভূতের ভয় কাজ করে বলে শেষ করা যায় না। সুতরাং শৈশবে ছেলেদের আদর করা বা শাসন করা বা তাদের নিয়ে ওঠা-বসার সঙ্গে দেখছো আমাদের জাতীয় চরিত্রের গড়ন নির্ভর করছে। সুতরাং তুমি যেটা মনে করছো তোমার একার সমস্যা, মোটেই তা তোমার একার সমস্যা নয়। এটা হলো আমাদের একটা জাতীয় সমস্যা।

প্রত্যেক ছেলেমেয়েরই উচিত সজাগভাবে মন থেকে এই ভয়কে দূর করার চেষ্টা করা। কি করে তা করা যায়? সেটাই হলো আসল দরকারি জিনিস। ভয়কে তাড়াবার প্রথম অস্ত্র হলো ভয় সম্বন্ধে সজাগ হওয়া। ভয়ের হাতে নিজেকে অন্ধভাবে ছেড়ে দিলে কিছুতেই সে ভয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না। ভয় পেলেই, নিজের মনে বিচার করে দেখতে হবে কেন ভয় পাচ্ছি, সত্যিকারের কোনো কারণ আসে কিনা। যে জিনিসটা আমাকে ভয় দেখাচ্ছে, ভয়ে তার কাছ থেকে পালিয়ে না গিয়ে সাহস করে তার কাছেই এগিয়ে গিয়ে দেখতে হবে, তার আসল চেহারা কি। সেই সঙ্গে মনে একটা বিশ্বাস রাখতে হবে, যদি আমাদের জগতের বাইরে অন্য কোনো জীবের অস্তিত্ব থাকে, তাহলে তারা আমাদের কোনো অকল্যাণই করবে না। আমি যদি কারুর অকল্যাণ না করি, কেউই আমার অকল্যাণ করতে পারে না। এই বিশ্বাস মনে গড়ে তোলার জন্যেই আমাদের সেকেলে লোকেরা রামনামের কথা বলেছেন। আর আমরা অধিকাংশ সময় অকারণে ভয় পাই এবং যা-থেকে থেকে ভয় পাচ্ছি, যদি সাহস করে তার স্বরূপ দেখবার জন্যে তার কাছে এগিয়ে যাই তাহলে দেখতে পাবো যেটাকে ভয়ের বস্তু মনে করেছিলাম, আসলে সেটা আমাদের তৈরি একটা মনের ভুল। ঘরে বা পোড়ো বাড়িতে যেসব অদ্ভুত মূর্তি চোখের সামনে ফুটে ওঠে, অন্ধকারে একটা ভাঙা গাছের ডাল বা ডালে আটকানো ছেঁড়া কাপড়, অধিকাংশ সময়েই আমাদের এমনভাবে ভয় ধরিয়ে দেয় যে তাকেই অপদেবতা বা উপদেবতার কাণ্ড বলে ধরে নিয়ে আমরা মুহ্যমান হয়ে পড়ি।

সংকলন : কৌশিক গুহ

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

বই কথা কই

বই চাই, আরো বই

সব সময়ে বই চাই— এমন কথা অমরা বলি। কারণ বইয়ের কোনো বিকল্প নেই। অনেকে বলেন, 'এখন ছেলেমেয়েরা পড়তে চায় না।' পাল্টা প্রশ্ন করা যায়, তাদের বই দেওয়া হয় কি? ভালোভাবে তৈরি বই তাদের হাতে তুলে দিলে আগ্রহে আঁকড়ে ধরবে। ভালোভাবে তৈরি বলতে বোঝায় যেসব বইয়ের লেখা যত্নে, আঁকা যত্নে। অর্থাৎ সুলিখিত সুচিত্রিত। এরপর আসে সুমুদ্রিত ও সুগ্রন্থিত। ভালো কাগজে ভালোভাবে ছাপা। সুগ্রন্থিত মানে ভালোভাবে বাঁধানো। সেজন্যে দরকার মনোযোগ, দক্ষতা, নিষ্ঠা। অনেক সময়েই তার অভাব দেখা যায়। অযত্নে তৈরি বই ছোটোদের ক্ষতি করে। সমসময় সেটা বড়োরা বুঝতে পারে না বলেই সমস্যা। ঠিক বইটি বেছে সংগ্রহ করলে আর যত্নে রাখলে স্থায়ী মূল্য থেকে যায়। বই কেন দরকার? জীবনকে বুঝতে গেলে অভ্যাসের সংস্কারের বেড়া ভাঙতে গেলে বই চাই। নানারকমের বই পড়া চাই। চারপাশ থেকে আলো এলে জীবন অন্যরকম হয়ে উঠবেই। আমরা সব বই সংগ্রহ করতে পারবো না— কিছু বই রাখতে অসুবিধে নেই। ছাপা বইয়ের পক্ষেই আমরা কথা বলতে চাই বারবার।

বইমিত্র

ছবিতে তফাত খোঁজা

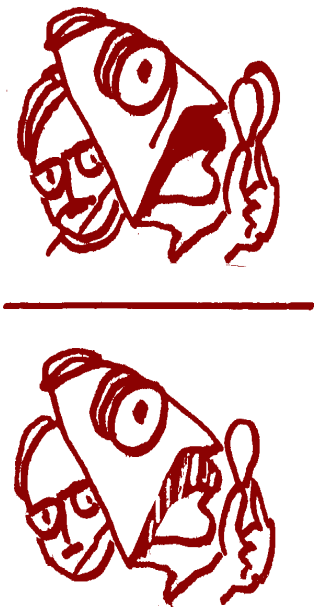

চিরদিনের পাঠ

সবার আমি ছাত্র

সুনির্মল বসু

আকাশ আমায় শিক্ষা দিল
উদার হতে ভাই রে,
কর্মী হবার মন্ত্র আমি
বায়ুর কাছে পাই রে।
পাহাড় শিখায় তাহার সমান
হই যেন ভাই মৌন-মহান,
খোলা মাঠের উপদেশে—
দিল খোলা হই তাই রে।

সূর্য আমায় মন্ত্রটা দেয়
আপন তেজে জ্বলতে,
চাঁদ শিখাল হাসতে মেদুর,
মধুর কথা বলতে।
ইঙ্গিত তার শিখায় সাগর—
অন্তর হোক রত্ন-আকর;
নদীর কাছে শিক্ষা পেলাম
আপন বেগে চলতে।

মাটির কাছে সহিষ্ণুতা
পেলাম আমি শিক্ষা,
আপন কাজে কঠোর হতে
পাষাণ দিল দীক্ষা।
ঝরনা তাহার সহজ গানে
গান জাগালো আমার প্রাণে,
শ্যাম বনানী সরসতা
আমায় দিল ভিক্ষা।

বিশ্ব-জোড়া পাঠশালা মোর
সবার আমি ছাত্র,
নানান ভাবের নতুন জিনিস
শিখছি দিবারাত্র;
এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়
পাঠ্য সে-সব পাতায় পাতায়,
শিখছি যে-সব কৌতূহলে
সন্দেহ নাই মাত্র।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নারীভাবনা

আঁখি মহাদানী মিশ্র

বিখ্যাত বাঙালি বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বিশ্বদরবারে একজন প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী। এছাড়া আমরা তাঁকে জানি একজন প্রথিতযশা শিক্ষকরূপে। আরেকটি গুণ যা অনেকেরই অজানা, তা হলো ভারতীয় নারী জাতির প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধাবোধ। এই গুণ তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন তাঁর বাবা ও মায়ের কাছে। বাবা ও মা দেশীয় নারীর উন্নতিকল্পে প্রচুর সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিলেন। ছোট প্রফুল্লচন্দ্রের মনে দাগ কাটে বাবা মায়ের এই কাজ। বলা হয় গৃহ-ই প্রথম শিক্ষাস্থান আর মেয়েদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধের সূচনা এই গৃহ থেকেই। আরও বলা হয় মা-ই প্রথম শিক্ষাগুরু। তাও অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায় এই মহান ব্যক্তির ক্ষেত্রে। তিনি মায়ের ভাঁড়ার থেকে নিয়ে রুগ্ন দরিদ্রদের সাগু, বার্লি ও মিছরি দান করতেন। মা এই কাজকে প্রশ্রয় দিতেন, বকাবকি না করে 'মা-ও সানন্দে এই কাজে সাহায্য করিতেন।' ছোট থেকেই অন্যের জন্য, দরিদ্রের জন্য কাজ করার প্রেরণা তিনি মায়ের কাছ থেকে পান। তিনি যখন বিলেত যাত্রা করেন তখন 'জাত যেতে পারে— এই কারণে মা হয়তো বিলেত যাওয়ার আপত্তি করতে পারেন' ভেবেছিলেন, কিন্তু তাঁর কথায় ''আমার মা বিলেত যাওয়ায় আপত্তি করলেন না।''

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বাবা হরিশচন্দ্র রায় রাড়ুলী গ্রামে 'ভুবনমোহিনী বালিকা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৪৫ সালে। বাবার স্ত্রীজাতির উন্নতির দিকে নজর প্রভাব ফেলেছিল আচার্যের জীবনে।

আচার্য রায়ের মতে ভারতবর্ষে সবচেয়ে অবদমিত শ্রেণী হলো স্ত্রীজাতি। তাঁর মতে স্ত্রীজাতিকে গণ্ডমূর্খ ও অকেজো করে রেখে ''আমরা সমাজের আধখানা অঙ্গকে পক্ষাঘাতে পঙ্গু করে রেখেছি।'' তাই তিনি স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য নিরলস চেষ্টা করে গেছেন। তিনি চেয়েছেন 'পক্ষাঘাতে পঙ্গু' শ্রেণীকে সারিয়ে তুলতে। নারী ও পুরুষ সমাজের দুটি চাকা, একটি এগিয়ে গেলে ও অন্যটি পিছিয়ে পড়লে গাড়ি আর চলবে না, অকেজো হয়ে যাবে। 'এখন তখন' প্রবন্ধে তিনি লেখেন— ''দেশে স্ত্রীশিক্ষার অভাবে সমাজ-দেহের আধখানা তো অসাড় ও গতিহীন হয়ে আছে''।

গৃহই প্রথম শিক্ষালয় এবং মা-ই প্রথম শিক্ষক, তাই মায়েদের শিক্ষা জরুরি ছেলেমেয়েদের জন্য তথা সমাজের জন্য। যে বাড়ির মা-বোনেরা লিখতে পড়তে জানে না

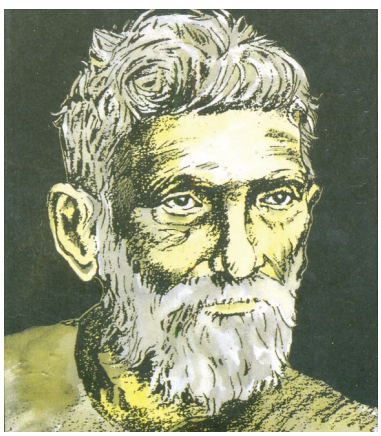

''সেই বালকের কাছে শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণের আশা করা বাতুলতা''— আচার্যের এই উক্তি প্রমাণ করে যে তিনি স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কতটা সচেতন ছিলেন। মায়েদের শিক্ষিত হওয়া খুব জরুরি একটি পূর্ণ শিক্ষিত সন্তান তৈরির জন্য। ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার অসারতা দেখে তিনি বলেন যে, ''আমাদের ছেলেমেয়েরা যখন মাতৃস্তন পান করে তখন তারা কুশিক্ষা পায়, কিন্তু ইংল্যান্ডের ছেলেমেয়েরা যখন মাতৃস্তন পান করে তখন তারা সুশিক্ষা পায়।'' অশিক্ষিত মায়ের কাছে ছেলেমেয়েরা পূর্ণ শিক্ষা পায় না— তাই তাদের শিক্ষা থেকে যায় অসম্পূর্ণ, ফলে সমাজ পিছিয়ে পড়ে।

স্ত্রীজাতির প্রতি আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের ছিল গভীর শ্রদ্ধাবোধ। তিনি মেয়েদের 'মা লক্ষ্মী' বলে সম্বোধন করতেন (বিশেষত সভাতে)। মেয়েদের তিনি সব সময় সম্মানের চোখে দেখতেন। তিনি ছিলেন স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী। তিব্বত ও বার্মা (বর্তমান মায়ানমারে) ভারত সংলগ্ন এই দুটি দেশের স্ত্রী-স্বাধীনতার ভুয়সী প্রশংসা করেন তিনি। তিনি সব সময় ভারতীয় মহিলাদের স্বাধীনতা চাইতেন। একবার তো ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন— ''আমরা আমাদের মেয়েদের স্বরাজ দিতে প্রস্তুত নই বলে আমরা স্বরাজের যোগ্য নই''। সমাজে সমতা বিধান না হলে সমাজের কাম্য ফল পাওয়া যায় না, যেমন বীজ আমরা বুনব ফসল তো তেমনই উঠবে।

'বেঙ্গল কেমিক্যাল'-এর প্রতিষ্ঠা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্ম। এই কর্মযজ্ঞে তিনি মহিলাদের দূরে সরিয়ে রাখেননি। পুরুষ শাসিত তৎকালীন সমাজে 'বেঙ্গল কেমিক্যাল'-এর পরিচালক মণ্ডলীতে তিনি দুজন মহিলাকে স্থান দেন, তারা হলেন বন্ধু অমূল্য বসু ও সতীশচন্দ্র সিংহের বিধবা পত্নীদ্বয়। তিনি সারাজীবন অবিবাহিত ছিলেন। তবে তিনি স্ত্রীজাতিকে অবজ্ঞা করে বিবাহ থেকে দূরে থাকেননি, তিনি বিজ্ঞানসাধনায়, দেশের উন্নতিকল্পে পূর্ণাঙ্গ নিয়োজিত হওয়ার কারণে সংসার জীবনে আবদ্ধ হননি।

তিনি মহিলাদের উন্নতিকল্পে অকাতরে দান করে গেছেন। অচলা বসুর বিদ্যালয়গুলির জন্য মাসে চারশ টাকা করে দিতেন। যা তখনকার দিনে অনেক টাকা। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। তিনি চাইতেন সমাজের সর্বস্তরে মহিলাদের অবাধ প্রবেশ। তাই জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হলে সেখানে কোনো মহিলা অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় তিনি ক্ষোভে বলেছিলেন— ''পৃথিবীতে স্ত্রীজাতি বলে যে কেউ আছেন, একথা তাঁরা ভুলে গেলেন।''

মোদী ও সচেতন পশ্চিম

অতিথি কলম

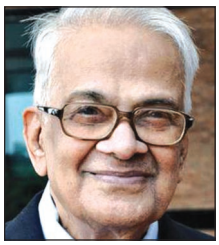

এম ভি কামাথ

শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে মোদীর নতুন সরকারের দীর্ঘ যাত্রা শুরু হয়েছে। কেউ স্বপ্নেও যা ভাবেনি তা হয়েছে— সারাদেশ সচেতন ভাবে বিজেপি এবং বিশেষভাবে মোদীকে দেশ পরিচালনার জন্য ক্ষমতা প্রদান করেছে। মোদীর এই বিজয়কে অনেকে তুলনা করেছে তিরিশের দশকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন ডিলেমো রুজভেল্টের সাফল্যের সঙ্গে। কিন্তু এই তুলনা নেহাতই অচল। নিশ্চিতভাবে রুজভেল্টের জয় অভাবিত হলেও মোদীর এই বিশাল বিজয় রুজভেল্টের সাফল্যকে ম্লান করে দিয়েছে। আপনারা নিশ্চিত হতে পারেন যে, রুজভেল্টের কাজকর্মকে অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবেন মোদী।

মোদীর জয় স্মরণ করিয়ে দেয় ভারত প্রগতির লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। অনেক আইকন রয়েছেন যাঁরা আমেরিকার রুজভেল্ট, বৃটেনের মার্গারেট থ্যাচার এবং সিঙ্গাপুরের লি কুয়াঁ ইয়ুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেও মোদীর সঙ্গে এঁদের তুলনা চলে না। কারণ এদেশ ১২০ কোটি মানুষের, এখানে রয়েছে বহু ধর্ম, বহু ভাষা এবং বহু সংস্কৃতির মানুষ। আর এদের আশীর্বাদ লাভ সহজলভ্য নয়। সত্যি বলতে কী, মোদীর এই সাফল্য অতুলনীয়। তিনি অতিক্রম করেছেন অনতিক্রম্য সাম্প্রদায়িকতা, বিভেদমূলক রাজনীতি, ভাষার স্বাভিমানত্ব এবং ঘৃণা— যা কোনো বিদেশি নেতাকে সামলাতে হয়নি। দেশজুড়ে মানুষ এবং শিল্প ও বণিক মহল তাঁর ওপর যে বিশ্বাস রেখেছে তা ইতিমধ্যে ফল প্রদান করতে শুরু করেছে।

ইকনমিক টাইমসে প্রকাশিত বিশ্লেষকদের মতে— দেশের ১২০০টি কোম্পানির আয় বাড়তে শুরু করেছে যার মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে ওইসব সংস্থার ত্রৈমাসিক আয় কমপক্ষে বিগত দু' বছরের মধ্যে শীর্ষে এবং লভ্যাংশ গড় তিন বছরের মধ্যে সবচেয়ে উঁচুতে। জানুয়ারি-মার্চ সময়কাল ভারতীয় শিল্পে এক পরিবর্তনের যুগের প্রারম্ভ। মোদী প্রেরণা যুগিয়েছেন ভারতীয় শিল্পকে এবং তাঁর ক্ষমতা লাভের পর অতি কম সময়ের মধ্যে দেশে অর্থনৈতিক চমক ঘটবে বলে আশা করা যায়।

এই প্রথমবার, নির্বাচনের প্রচারকালে তিনি বার বার যে কথাটা বলেছেন "Minimum Government and Maximum Governance"। যে সব মন্ত্রক তিনি গড়েছেন তারা নিজেদের মধ্যে সমন্বয় শুরু করেছে বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে।

গান্ধীনগর থেকে একটি সরকারি সূত্র বলছে যে, বিভিন্ন মন্ত্রকের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবেন একজন মন্ত্রী যিনি সমস্ত মন্ত্রীগোষ্ঠীকে নেতৃত্ব দেবেন। স্পষ্টত, পাশাপাশি কাজকর্ম আগের চেয়ে সহজতর হবে যেখানে প্রশাসনের ওপর সরকারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে, ইতিমধ্যেই দুই দেশ আমেরিকা এবং চীন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষায় কাজ করার আগ্রহ দেখিয়েছে।

গত ২৬ মে (২০১৪) ইকনমিক টাইমসের এক নিবন্ধে ভারতে নিযুক্ত চৈনিক রাজদূত মি. উই উই জানিয়েছেন যে, যথাসম্ভব দুই দেশের মধ্যে আরো নিবিড় ভাবে কাজকর্ম শুরু হবে। চীন ভারতকে পরিকাঠামো গড়ে দিতে চায় এই তত্ত্বে যে, নির্মাণ শিল্প ও পরিকাঠামো শিল্প

নরেন্দ্র মোদী

মোদীর এই বিজয়কে অনেকে তুলনা করেছে তিরিশের দশকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন ডিলেমো রুজভেল্টের সাফল্যের সঙ্গে। কিন্তু এই তুলনা নেহাতই অচল। নিশ্চিতভাবে রুজভেল্টের জয় অভাবিত হলেও মোদীর এই বিশাল বিজয় রুজভেল্টের সাফল্যকে ম্লান করে দিয়েছে।

রুজভেল্ট

একই মুদ্রার দুই পিঠ। তাঁর মতে, "চীন ও ভারতের মধ্যে সাধারণ উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হবে যদি না দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতায় বাতাবরণ না থাকে। সেই সঙ্গে দুনিয়ায় উন্নয়ন থমকে যাবে যদি না চীন ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতা থাকে।" নির্লজ্জভাবে আমেরিকাও এখন মোদীকে সহযোগিতা করতে চাইছে।

নিশা দেশাই বিসওয়াল যিনি আমেরিকার দক্ষিণ মধ্য এশিয়া সংক্রান্ত কাজকর্মের সহকারী সচিব, তিনি জানিয়েছেন যে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামা ও রাষ্ট্রসচিব জন মেরি উভয়েই চান ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক এবং তাঁরা মোদীকে নিজেদের দেশে আসার আমন্ত্রণও করেছেন। অনেক আগেই মার্কিনমুলুক নবদিগন্তে আলোর ঝলকানি দেখেছে, দুই ইউরোপীয় দেশ স্থির করেছে যে তারা মোদীকে অবজ্ঞা করবে না এবং এজন্য সাবাশ জানানো দরকার ডেনমার্ক ও সুইডেনকে।

২০০৮ সালে ইউরোপের দুই ডিপ্লোম্যাট— ডেনমার্কের ওলে পলসেন এবং সুইডেনের লার্স-ওলাফ লিন্ডগ্রেন ইউরোপীয় ভিসা নিষেধাজ্ঞাকে বাতিল করেন। এই দুই স্ক্যান্ডানেভিয়ান রাষ্ট্র নিজেদের বাস্তববাদী হিসেবে প্রমাণ করেছে এবং তারা আরো বেশি বাস্তববাদী বৃটেনের থেকে যে দেশ নিজেদের বাস্তববাদী বলে দাবি করে থাকে।

বৃটিশ হাইকমিশনার জেমস বিভান ২০১২ সালে আমেদাবাদে এসে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে করমর্দন করেন। এইভাবে দশ বছর ধরে চলে আসা কূটনৈতিক সম্পর্কের শীতলতা দূর হলো। এর পরে জার্মান ও ফরাসীদের পালা। আস্তে আস্তে সবাই-ই মোদীর সঙ্গে সহমত পোষণ করবেন। অবশিষ্ট দুনিয়ার ক্ষেত্রে আর বেশিদিন নেই যেদিন সারা দুনিয়া মোদীর সঙ্গে মোদীর-ই শর্তে সখ্য বাড়াবে।

(লেখক একজন প্রখ্যাত স্তম্ভ লেখক)

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০্ টাকা
প্রতি কপি ১০্ টাকা

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

কোটিপতি হোন!
নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন
মিউচুয়াল ফাণ্ডে SIP করুন
১০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৩ পর্যন্ত SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ৩২ লাখ টাকা।
যোগাযোগ : দেবাশিষ দীর্ঘাঙ্গী, শুভাশিষ দীর্ঘাঙ্গী
DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
9830372090
9433359382
মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,
১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) : ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন : ২৪১৫-৩৫৬৬

সংস্কৃত, রাষ্ট্রীয় সংহতি ও আমরা

ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার

ভারতবর্ষের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক সমস্ত অঙ্গরাজ্যকে ৭ থেকে ১৩ আগস্ট পর্যন্ত সংস্কৃত-সপ্তাহ পালন করার উদ্যোগ নিতে নির্দেশ দিয়েছে। যাইহোক, স্বাধীনতার অন্তত ছেষট্টি বছর পরে আমরা প্রকৃত স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীন একটি পদক্ষেপের প্রথম পরিচয় পেলাম। আজ তবু ভারতবর্ষকে ভারতবর্ষ মনে হচ্ছে; 'ইন্ডিয়া' নয়। মেকলে ও মার্কসপন্থী বিশেষত সেকুলারবাদীরা অবশ্যই এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করবেন। ইতিমধ্যে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতা বেসুরো গান গাইতে শুরু করেছেন। হঠাৎ তাঁর তামিল ভাষা প্রীতি চাগাড় দিয়ে উঠেছে। তিনি তামিল সংস্কৃতির, তামিল ভাষার জয়গান গাইবেন, সংস্কৃতের নয়। কিন্তু সহজ কথা সহজ ভাবেই বোঝা শ্রেয়, কোদালকে কোদাল বলাই ভালো। সংস্কৃত-সপ্তাহ পালনের সঙ্গে তামিল-প্রীতিকে জড়িয়ে দিয়ে অযথা জলঘোলা করে লাভ কি? এতে তো আখেরে দেশেরই ক্ষতি। যিনি তামিলভাষী তাঁর সংস্কৃত প্রেমে আপত্তি কোথায়? কেন, তামিল কি সংস্কৃতের কাছে ঋণী নয়? কিংবা কোনো তামিলভাষী কি সংস্কৃত শিখলে অচ্ছুৎ হয়ে যাবেন? মেকলে-মার্কসপন্থী কিংবা সেক্যুলারবাদীর কাছে অবশ্য দেশহিত আশা করাই বাতুলতা। কারণ এরাই তো একদিন দ্বিজাতি তত্ত্বের ভুতুড়ে থিয়োরি আবিষ্কার করে ভারত ভাগ করেছিল। এখন আবার সেক্যুলারিজিমের এক অদ্ভুতুড়ে ধুয়ো তুলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নামে এক নবদেবতার পায়ে সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে ভোট-বৈতরণী পার হয়ে ক্ষমতার কুর্সিতে বংশ-পরম্পরায় বসার মৌরসী পাট্টা পাবার কসরত করে চলেছেন।

এইসব অন্যপুষ্ট শাবকদের জেনে রাখা উচিত, শাক দিয়ে যেমন মাছ ঢাকা দেওয়া যায় না, ছাই দিয়ে যেমন আগুন চাপা দেওয়া যায় না, তেমনি মেকলে মাকর্সের 'ইন্ডিয়া' দিয়ে বিবেকানন্দের স্বপ্নের ভারতে শাশ্বত সনাতন ভারতবর্ষকে চাপা দেওয়া যাবে না। তুষের আগুনের মতো ধিকিধিকি জ্বলতে জ্বলতে একদিন সে দাবানলের মতো জ্বলে উঠবে। সেই আগুনে এইসব অন্যপুষ্টের দল পতঙ্গবৎ পুড়ে মরবে। কোনো কোম্পানির দমকলবাহিনী সে আগুন নেভাতে পারবে না; তা যে মেকলে-মাকর্সেরই হোক আর সেক্যুলারিজমেরই হোক। আজ তার লক্ষণ সুস্পষ্ট। কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের সংস্কৃত সপ্তাহ পালনের নির্দেশ সেই ভাবী দাবানলের একটি স্ফুলিঙ্গ মাত্র। ভারতবর্ষ তার আপন মহিমায়, আপন শক্তিতে জেগে উঠছে। এতদিন সে ঘুমিয়ে ছিল বলে চিরদিন ঘুমাবে— এ খোয়াব কেউ দেখলে, তিনি মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। শুধু তাই নয়, অচিরাৎ তিনি সেই স্বর্গ থেকে ত্রিশঙ্কুর ন্যায় পতিত হবেন।

ভারতবর্ষ আর এই অন্যপুষ্ট শাবকদের অধীনে থাকতে চায় না; তা সে হ্যারো-কেম্ব্রিজের আঁতুড় জাত হোক, কিংবা হার্বার্ড-শিকাগোর আঁতুড় জাতই হোক! ভারতবর্ষ এখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের কথা বিশ্ববাসীকে বলতে চায়। তার আর হ্যারো-হার্বার্ডের ক্র্যাচ প্রয়োজন নেই। ভারতবর্ষ যে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে তারই অন্যতম প্রকাশ সংস্কৃত-সপ্তাহ পালনের নির্দেশ। ভাষা একটি রাষ্ট্রের স্বাভিমানের অভিজ্ঞান। ভাষাকে কেন্দ্র করে বিশ্বে কত বিপ্লব, কত রক্তক্ষয়, কত নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। ভাষা একটি রাষ্ট্রের মর্যাদা, জাতির উন্নতির সোপান। ইংরেজ আমাদের ভাষাগত স্বাভিমানকে নষ্ট করেছে; যা মুসলমান শাসকরা শত-শতবর্ষেও পারেনি। মুসলমান-ভারতে মানুষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না ঠিকই; কিন্তু

ব্যাঙ্গালোরে বিশ্ব সংস্কৃত পুস্তক মেলার দৃশ্য।

আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ছিল। ইংরেজ কেবল ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতাই হরণ করেনি, করেছে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক সকল প্রকার স্বাধীনতা। তারা ভারতবাসীকে ক্রীতদাসে পরিণত করার হীন চক্রান্ত ও জঘন্য প্রচেষ্টা করেছিল, যার কিছু নিদর্শন আমরা এখনও 'শয়তানি ইস্কুলের ছিন্নমস্তা শিক্ষা' ব্যবস্থায় দেখতে পাই। সেই ইংরেজ যখন দেখলো ভারতবর্ষে তাদের এক বিশ্বস্ত দালাল শ্রেণী তৈরি হয়েছে, তখন তাদেরই সহায়তায় ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে তাদেরই নেতৃদ্বয় নেহরু-জিন্নার হাতে ভারতের ভাগ্য সঁপে দিয়ে কেটে পড়লো। এরই পোশাকি নাম স্বাধীনতা। আর আমরা সেই তালে-গোলে হরিবোল মার্কা স্বাধীনতা পেয়ে সানন্দে আপন-আপন বৃদ্ধাঙ্গুলি মুখে পুরে নাচতে লাগলাম। বুড়ো আঙুল চুষতে চুষতে ছেষট্টি বছরে তা সরু হয়ে গেল, তবু আমাদের চৈতন্য হলো না। আজ যে একটু-আধটু চৈতন্য হচ্ছে তার নমুনা এই সংস্কৃত-সপ্তাহ পালনের নির্দেশেই নিহিত। এর মধ্যেই রয়েছে ভারতের ভাষা-স্বাভিমান, দেশাত্মবোধ। এতদিন ইংরেজের ইস্কুলে শেখানো হয়েছে; ইংরেজ বিশ্বের সেরা জাতি, ইংরেজের সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না, ইংরেজি বিশ্বের সেরা ভাষা। আমাদের

দেশের মনীষীরা এইসব মিথ্যা বেসাতির বিরুদ্ধে দেশবাসীকে বারংবার সচেতন করেছেন। কিন্তু 'গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না' বলে তাঁদের সাবধানবাণী আমাদের কানে 'উল্টা সমঝলি রাম' হয়ে গেল। তাঁদের উপদেশে কেউ কর্ণপাত করলাম না।

প্রথম দিন পাল্টাচ্ছে— সুদিন আসছে। নতুন প্রজন্ম নবভারতের কথা ভাবছে। দেশের মনীষীদের কথা শুনছে। এতদিন পরে ভারতের যিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, তিনি স্বাধীন ভারতে জন্মেছেন। তাঁর কাজকর্ম, চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণায় স্বাধীন ভারতের স্বাধীন চিন্তার স্পর্শ পাই; ভারতাত্মার সন্ধান পাই। বুঝতে পারি— 'ভারত আবার

ব্যাঙ্গালোরে পুস্তক মেলায় সংস্কৃত প্রদর্শনীতে যুবক-যবতীদের ভিড়।

জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে' সত্য হতে চলেছে। জানি ভারতের এই উন্নতি মেকলে ও মার্কস পন্থীদের চোখের বালি। তারা চিরকাল ভারতের সমৃদ্ধির বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে এসেছে। আজ তারা শতচেষ্টা করেও ভারতের উন্নয়ন রোধ করতে পারবে না। 'অব আচ্ছে দিন আনেওয়ালে হ্যায়'। সংস্কৃত সপ্তাহ পালনের সরকারি নির্দেশ তারই প্রকাশ।

সংস্কৃত-সপ্তাহ পালন আমাদের গর্বের বিষয়। কারণ সংস্কৃত বিশ্বের প্রাচীনতম ভাষা। শুধু তাই নয়, বিশ্বের অধিকাংশ মানুষের ভাষা সংস্কৃত প্রসূতা, নতুবা সংস্কৃত প্রভাবিতা। এমন সমৃদ্ধিশালী সর্বার্থসাধক ভাষার অধিকারী হিসেবে আমাদের স্বাভিমান বৃদ্ধি পাবে। একথা সত্য যে, মানবসভ্যতার ঊষাকাল থেকেই ভারতবর্ষে সভ্যতা সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশ দেখা গেছে, যার নিদর্শন বিশ্বের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে বিদ্যমান। ঋগ্বেদের যে-কোনো একটি সূক্ত (Hymn) পাঠ করলে বোঝা যায় মানবসভ্যতা কত উন্নত পর্যায়ে উপনীত হলে তার সাহিত্যিক প্রকাশ এমন উচ্চতম পর্যায়ে পৌঁছতে পারে। ঋগ্বেদ আজ অন্যতম World-Heritage। ঋগ্বেদের মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে ইউনেস্কোর সভা শুরু হয়। এই ঋগ্বেদ কোন্ ভাষায় লেখা— সংস্কৃতে, বৈদিক সংস্কৃতে। এমন একটি ঐতিহ্যশালী ভাষা চর্চায় আপত্তি কোথায়; কেন? তবে কি এই আপত্তির মধ্যে অন্য স্বার্থ লুকিয়ে আছে?

পৃথিবীতে যত ভাষা আছে, তার মধ্যে সংস্কৃত শুধু প্রাচীনতম নয়, সর্বার্থসাধক। দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, মানবমনের সকল শাখায় সংস্কৃত ভাষার স্বাভাবিক সাবলীল সার্থক বিচরণ বিশ্বের সকল ভাষাবিজ্ঞানীকে বিস্মিত করে। একথা সত্য, সংস্কৃত ভাষায় ভারতাত্মার সকল কথাই বলা হয়েছে। সর্বোপরি সংস্কৃত ব্যাকরণ শাসিত, বিজ্ঞান-নিয়ন্ত্রিত এমন একটি ভাষা যা আজ একমাত্র কম্পিউটর উপযোগী ভাষা বলে সর্বজনস্বীকৃত। পৃথিবীর সেরা দেশ ভারতবর্ষকে মুনি-ঋষিরা বলেছে 'দেবভূমি'। এই অখণ্ড ভারতের সীমানা হিমালয় থেকে শ্রীলঙ্কা, উপগণস্থান (আফগানিস্তান) থেকে ব্রহ্মদেশ। এছাড়া বৃহত্তর ভারত বলতে বোঝায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপরাষ্ট্র সমূহ— যবদ্বীপ, সুমাত্রা, কম্বোজ, শ্যাম প্রভৃতি। এই শস্যশ্যামলা, সুজলা সুফলা দেশের প্রতি বিদেশীদের শ্যেনদৃষ্টি চিরকালই ছিল। বহু বিদেশি, বহুকাল যাবৎ ভারতে এসেছে অন্নবস্ত্রের আশায়, আসলে যা ছিল সাম্রাজ্য স্থাপনের নামান্তর। কিন্তু ভারতীয় সমাজ-সভ্যতা তাদের আপন করে নিয়েছে। এটি ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য। এই ভারতে একসময় বহু একরাট্ সম্রাট আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁরা সসাগরা ধরণীর উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছেন। শ্রীরামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ মহারাজ রঘু সমগ্র ভারতবর্ষ আপন করতলগত করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্র লঙ্ঘন করে শ্রীলঙ্কা দ্বীপরাষ্ট্রকেও আপনার সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। তারপর সম্রাট যুধিষ্ঠির সসাগরা ভারতভূমির একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করেন। এই পথ অনুসরণ করে সম্রাট অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত সকলেই ভারতবর্ষে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। এখন প্রশ্ন, এই বিচিত্র ভারতবর্ষকে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে সে যুগের সম্রাটরা যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন, সেই সাম্রাজ্য কীভাবে পরিচালিত হোত? তার বিচার ব্যবস্থা, আইন-কানুন, রাজকার্য কোন ভাষায় চলতো? তা কি সংস্কৃত নয়? যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষে যে সাম্রাজ্য পরিচালিত হয়েছে, যে সমাজ পরিচালিত হয়েছে তার পরিচালিকা শক্তি ছিল সংস্কৃত ভাষা। তাই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক- সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐক্যসাধনে সংস্কৃতভাষার অবদান অনস্বীকার্য। সে যুগে রাজকার্য চলতো সংস্কৃতে, রাষ্ট্রদূত সংস্কৃত ব্যবহার করতো, ব্যবসা-বাণিজ্য সংস্কৃতে চলতো। এক কথায় একটি উন্নত দেশের সমস্ত কাজকর্ম, আচার-বিচার সবকিছু চলতো এই সংস্কৃত ভাষায়। সংস্কৃত ছিল ভারতের রাষ্ট্রভাষা। সর্বজনবোধ্য শিষ্ট ভাষা। এই ভাষায় লোকে কথা বলতো। শুধু প্রাচীনকালে নয়; বর্তমানেও সংস্কৃত ভাষাই ভারতের রাষ্ট্রীয় সংহতি রক্ষার মূলসূত্র। অধুনা প্রচলিত সমস্ত ভারতীয় ভাষাই সংস্কৃত জাত কিংবা সংস্কৃত প্রভাবিত। ভারতীয়দের ধর্মীয় ও সামাজিক কাজে আজও সংস্কৃত ভাষা ব্যবহৃত হয়। আসমুদ্রহিমাচল ভারতবাসী একই মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে সামাজিক ও ধর্মীয় কার্য নির্বাহ করে।

বাঙালি, গুজরাটি, রাজস্থানি, তামিলি সকলেই এই সংস্কৃতে একই মন্ত্র পাঠ করে বিবাহাদি দশবিধ সংস্কারের কাজ এবং পূজাপার্বণাদি ধর্মীয় কাজ অনুষ্ঠান করে। সংস্কৃত ভাষা সকলের অলক্ষ্যে আমাদের রাষ্ট্রীয় সংহতি ফল্গুধারার ন্যায় বহন করে চলেছে। বিদেশি শাসক এবং তাদের চ্যালাচামুণ্ডারা শতচেষ্টা করেও সংস্কৃত ভাষাকে এই রাষ্ট্রীয় সংহতি রক্ষার কাজ থেকে অপসারিত করতে পারেনি। আর আমরা সংস্কৃত ভাষার এই নীরব মহতী কার্যাবলী বিস্মৃত হয়ে উটপাখির মতো বিদেশি ভাষার মরুভূমিতে মুখ গুঁজে দিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভে ব্যস্ত রয়েছি। আর সংস্কৃতকে 'Dead Language' বলে শিকেয় তুলেছি।

একথা তো দিনের আলোর মতো পরিষ্কার যে, প্রাচীন ভারতের 'Lingua-Franca' ছিল সংস্কৃত। প্রাচীন ভারতের রাজাধিরাজদের শিলালেখ, তাম্রলেখ, মুদ্রা, নানাবিধ গ্রন্থ প্রভৃতি থেকে জানা যায় যে, সে যুগে সংস্কৃত ছিল ভারতের রাষ্ট্র ভাষা; যা রাষ্ট্রীয় সংহতি রক্ষায় অপরিহার্য। সে যুগে মানুষ তীর্থ পর্যটন করতো, ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যপদেশে দেশবিদেশে যাতায়াত করতো, রাজকার্য পরিচালনা করতো। তারা কী ভাষা ব্যবহার করতো? ইংরেজি? সে যুগের ন্যায়াধীশরা কী ভাষায় বিচারের রায় ঘোষণা করতেন? কী ভাষায় সে যুগে দলিল লেখা হোত? কী ভাষায় সৈন্য চালনা করা হোত? ইংরেজির মাধ্যমে? পাগলেও একথা বলবে না, ছাগলেও এই তত্ত্ব খাবে না। এইসব কাজ সে যুগে সংস্কৃতে করা হতো। সংস্কৃত তখন 'নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান'-এর দেশ ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক সংহতি রক্ষা করেছিল; যার ফলশ্রুতি আধুনিক ভারতরাষ্ট্র। এখন প্রশ্ন, একটি রাষ্ট্রের সমস্ত কাজ যদি সংস্কৃতে পরিচালিত হোত তবে আজ কেন তা করা যাবে না? অবশ্যই করা যাবে। অধুনালুপ্ত হিব্রুভাষা পুনরুদ্ধার করে ইজরায়েল যদি তাকে তাদের রাষ্ট্রভাষা করতে পারে তবে বর্তমানে প্রচলিত সংস্কৃতভাষা কেন ভারতের রাষ্ট্রভাষা হতে পারবে না? এ কেবল সদিচ্ছার অভাব। বর্তমান ভারতবর্ষে রাষ্ট্রভাষা সমস্যার সমাধান একমাত্র সংস্কৃতভাষার সাহায্যেই হতে পারে। সংস্কৃত ভারতের রাষ্ট্রভাষা হলে ভাষাভিত্তিক প্রাদেশিকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ বিনষ্ট হবে। কারণ ভারতের প্রতিটি ভাষা (প্রাদেশিক) সংস্কৃতভাষা জাত কিংবা সংস্কৃতভাষা প্রভাবিত। ফলে সংস্কৃত শিক্ষণ ভারতবাসীর পক্ষে অতি সহজ। তাছাড়া 'সংস্কৃত ভারতী' মাত্র দশদিনে, প্রতিদিন দুই ঘণ্টা ব্যয়ে যে-কোনো মানুষকে কথ্য-সংস্কৃত শিখিয়ে দিচ্ছে। কত হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী এবং নানা পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তি যে কথ্য সংস্কৃত শিখছেন তার ইয়ত্তা নেই। তাই আর দেরি নয়। ভারতবর্ষকে যদি শক্তিশালী করে তুলতে হয় তবে সর্বার্থসাধক, শক্তিশালী, রাষ্ট্রীয় সংহতি রক্ষাকারী সংস্কৃত ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করে তুলতে হবে। সংস্কৃত-সপ্তাহ পালনের মধ্য দিয়ে আমরা সংস্কৃতভাষার সেই ঐতিহ্য ও ক্ষমতাকে যাতে বিস্মৃত না হই, সেই ব্যবস্থাই কেন্দ্রীয় মানব উন্নয়ন মন্ত্রক করেছেন। সেই মন্ত্রকের মন্ত্রীকে সর্বোপরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

KIND ATTENTION TO HOUSE OWNERS

"WATER SEAPAGE IS A DISEASE LIKE A CANCER OF YOUR DREAM HOME. REMOVE IT AND SAFE YOUR HOME"

OUR SERVICES :

** Heat & Waterproof Solution for your Heated Roof.
** Waterproof Treatment of Roof, roof Garden Water Tank, Lift Pit, Water Body Etc.
** Leakage, Dampness & Salt Petre Treatment.
** Anti-Termite & Pest Control Treatment

CONTACT :

Calcutta Waterproofing Company
'Park Plaza'
71, Park Street, Room No. 11/12, Kolkata-700 016
98311 85740/9831272657–
emil : roy4258@yahoo.com,
web : www.calcuttawaterproofing.com

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের শিল্প ভাবনা

রাজদীপ মিশ্র

ভারতবর্ষ তথা সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানাকাশে যে কয়েকজন বিজ্ঞানী বহুমুখী প্রতিভার জন্য চিরভাস্বর, তাঁদের মধ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় অন্যতম। একাধারে তিনি যেমন ছিলেন দিগ্বীজয়ী বিজ্ঞানী, সমাজ সচেতন নাগরিক, কর্মোদ্যমের আগুনে উদ্ভাসিত এক জ্বলন্ত প্রাণ; তেমনই অপরদিকে ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক

অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে বক্তব্য রাখছেন আচার্য প্রফুল্ল রায়

এবং শিল্পভাবনায় ভাবিত এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। ঋষির মতো অনাড়ম্বর, ত্যাগী জীবন যাপন তাঁর ছাত্রদের মনে অভূতপূর্ব প্রভাব বিস্তার করেছিল।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের শিল্পভাবনা নিয়ে দু-চার কথা বলার জন্যই বর্তমান প্রবন্ধ। তাঁর অক্ষয় কীর্তিগুলির মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি হলো ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি এবং বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠা।

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি বিদেশের অনেকগুলি বড়বড় রাসায়নিক কারখানা পরিদর্শন করে বুঝেছিলেন যে, কারখানাগুলি তাদের প্রস্তুতসামগ্রী আমাদের দেশে রপ্তানি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করছে। শুধু তাই নয়, তারা আমাদের দেশে কোনো কারখানাও স্থাপন না করে আমাদের পরনির্ভরশীল করে রেখেছে। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকের চাকরিতে যোগদান করার পরই তাঁর মনের মধ্যে স্বদেশী রসায়ন শিল্প গড়ে তোলার বাসনা জাগ্রত হয়। এই সময় এমন একটি ঘটনা ঘটে, যেটি তাঁর এই ভাবনাকে বাস্তব রূপে দিতে সহায়তা করে। ঘটনাটি হলো— তিনি ১৮৮৯ সালে মাত্র ২৫০ টাকা বেতনে প্রেসিডেন্সি কলেজে সহকারী অধ্যাপক পদে চাকরিতে যোগ দেন। তখন ইংরেজ অধ্যাপকরা ইংরেজ হওয়ার সুবাদে উচ্চপদে আসীন হতেন এবং একই শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় অধ্যাপকদের থেকে তিনগুণ বেশি বেতন পেতেন। স্বদেশপ্রেমিক, স্বাভিমানী প্রফুল্লচন্দ্রের মনে এ বিষয়ে যথেষ্ট অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। এই দ্বিমুখী নীতির অবসানের জন্য তিনি শিক্ষাবিভাগের সঞ্চালকের সঙ্গে দেখা করতে যান। সমগ্র বিষয় শোনার পর ইংরেজ সঞ্চালক ব্যঙ্গ করে বলেন, ''যদি আপনি এতই রসায়নবেত্তা হন, তবে কোনো স্বাধীন ব্যবসা করছেন না কেন?'' এই ব্যঙ্গই তাঁর শাপে বর হলো।

আমাদের দেশের অসংখ্য প্রাকৃতিক সম্পদকে শিল্পের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করার উপায় আচার্যদেব ভাবতে লাগলেন। মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল অ্যান্ড কোম্পানির কর্ণধার ভূতনাথ পালের সহায়তায় পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই তিনি নেমে পড়লেন ভেষজ প্রস্তুত করার কাজে। মাত্র ৮০০ টাকার পুঁজি নিয়ে ১৮৯১ সালে ৯১নং আপার সার্কুলার রোডে নিজের বাড়িতে বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। মূলত একটি ওষুধ তৈরির কারখানা হিসেবেই এটি কাজ শুরু করে।

প্রথমদিকে বেঙ্গল কেমিক্যালের উৎপাদিত দ্রব্য দোকানদাররা কিনতে চাইত না। সে সময় প্রফুল্লচন্দ্রের দেশীয় কয়েকজন ডাক্তারবন্ধু তাঁর পাশে দাঁড়ান। তাঁদের সুপারিশে অন্য চিকিৎসকরা স্বদেশী কারখানার ওষুধ রোগীদের সেবনের নির্দেশ দিতে লাগলেন। ধীরে ধীরে এর পসার বাড়তে লাগল। পাঁচ বছর পর বেঙ্গল কেমিক্যালকে একটি লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত করা হলো। ১৮৯৮ সালে ক্যালকাটা মেডিকেল কংগ্রেসের অধিবেশনে দেশীয় ভেষজের কার্যকারিতা ও তার প্রয়োগ সাফল্যের জন্য আচার্যের উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়।

শিল্পে আচার্যদেবের প্রথম সার্থক উৎপাদন হলো স্ক্র্যাপ আয়রন বা বাতিল লোহা থেকে তৈরি হীরাকস্ এবং হাইড্রেটেট কোরাস সালফেট। চা পাতার গুঁড়ো থেকে তৈরি হোত ক্যাফিন। এছাড়াও বেঙ্গল কেমিক্যালের তৈরি হোত 'এফিড্রিন', 'স্যান্টোনিন', 'স্টিকনিন' প্রভৃতি ইঞ্জেকশনের ওষুধ এবং 'ফেরিআয়োডাইড', 'লিকার আর্সেনিকেলিস্' জাতীয় সিরাপ। এখানে যেসব ভেষজ সিরাপ তৈরি হোত, যা আজও আমাদের ঘরে ঘরে আছে; সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— জোয়ান, বাসক, কুর্চি, কালমেঘ।

ধীরে ধীরে কারখানার শ্রীবৃদ্ধির ফলে ওই ছোট ঘরটিতে উৎপাদন আর সম্ভব হচ্ছিল না। পানিহাটিতে নতুন কারখানার জন্য ১৩৩ বিঘা জমি কেনা হলো। ১৯০৫ সালে বেঙ্গল কেমিক্যালে ম্যানেজার পদে যোগ দেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক রাজশেখর বসু (পরশুরাম)। ১৯৩৪ সালে বোম্বাই প্রদেশে বেঙ্গল কেমিক্যালের শাখা গড়ে ওঠে। মুরারীপুকুরে তিনি হাড় থেকে ফসফেট তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। সেখানে ১৯০০ সাল থেকে ফসফেট প্রস্তুতি শুরু হয়।

মানিকতলা ও পানিহাটিতে তৈরি দুটি কারখানায় আয় দ্রুত

বাড়তে লাগল। এই কারখানাগুলি এদেশের বহু মানুষের রুজি-রোজগারের পথ খুলে দিল। দেশীয় ওষুধের কার্যকারিতার চাহিদা ক্রমশ বাড়তে লাগল। নিজের অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং অনেকের সহায়তায় তিনি স্বাধীন ব্যবসার এক দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য বড় শহরে ওষুধের যেসব বড় বড় স্বদেশী কোম্পানি গড়ে উঠেছিল, সেগুলির অনুপ্রেরণা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে বেঙ্গল কেমিক্যাল। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিভা ও তাঁর প্রদর্শিত পথেই বিদেশের একচেটিয়া শোষণের হাত থেকে আমাদের দেশ অনেকটা পরিমাণ রক্ষা পেয়েছে। বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রফুল্লচন্দ্রের স্বদেশসেবার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

দেশীয় উদ্যোগকে ধ্বংস করার জন্য বৃটিশ কোম্পানি স্টিমারের ভাড়া এক টাকা থেকে কমিয়ে এক আনা করে দিয়েছিল। প্রফুল্লচন্দ্রের কোম্পানি এই অসম প্রতিযোগিতায় ২ লক্ষ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন হলো। তবুও তিনি কিন্তু দমেননি, প্রফুল্লচন্দ্র

বেঙ্গল কেমিকেল।

সহজে কোনো কাজে হার মানতেন না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সাফল্য তখনই আসবে যখন কেউ কোনো কাজে স্থিরভাবে ও সৎভাবে লেগে থাকবেন।

শুধু নিজে শিল্পে যুক্ত থাকাই নয়, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান আরম্ভ করতে তিনি অনেককে সাহায্য ও প্রভাবিত করেছিলেন। বস্ত্রশিল্প, সাবানশিল্প, চিনি ও রসায়ন শিল্প, প্রকাশনা শিল্প প্রভৃতি তাঁর সক্রিয় সহযোগিতায় গড়ে উঠেছিল। ১৯৩৪ সালে তিনি খুলনা কটনমিল প্রতিষ্ঠা করেন এবং ওই বছরই মেদিনীপুরে 'বেঙ্গল সল্ট কোম্পানি' স্থাপন করেন।

তখন ইনসিওরেন্সের টাকা বেশিটাই উঠত বাংলা থেকে কিন্তু বাঙালি এই পরিষেবায় তেমন যুক্ত নয়।

তাই আচার্যের পরামর্শে সুরেশচন্দ্র রায় 'আর্যস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানি' গঠন করেন এবং এই ব্যবসা বাড়ান।

আচার্যদেব ১৯১৭ সালে 'বেঙ্গল কেমিক্যাল কো-অপারেটিভ সোসাইটি' এবং ১৯৩৮ সালে 'ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারস্ অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন।

শিল্প বিষয়ে তাঁর ভাবনা সত্যিই অবাক করার মতো! বাঙালির দুর্দশা নিয়ে তিনি যথেষ্টই ভাবিত ছিলেন এবং এই দুর্গতি নিবারণের উপায় হিসাবে তিনি একবার খুব আপশোস করে বলেছিলেন— 'উচ্চশিক্ষা যাহারা লইবে না, তাহারা যদি পড়া শেষ করিবার পরই ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতিতে শিক্ষানবিশ আরম্ভ করিত!'

১৯৪০ সালের ১৩ ডিসেম্বর জীবনে প্রথমবার বেতার ভাষণে তিনি বলেছিলেন— "ভারতবাসী এখনও ফেরো, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসায় মন দাও, তবে বাঁচতে পারো, নইলে তোমাদের ভবিষ্যৎ নেই।"

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতিতে ১৯৪০ সালের আচার্যের এই উক্তি অতি প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়।

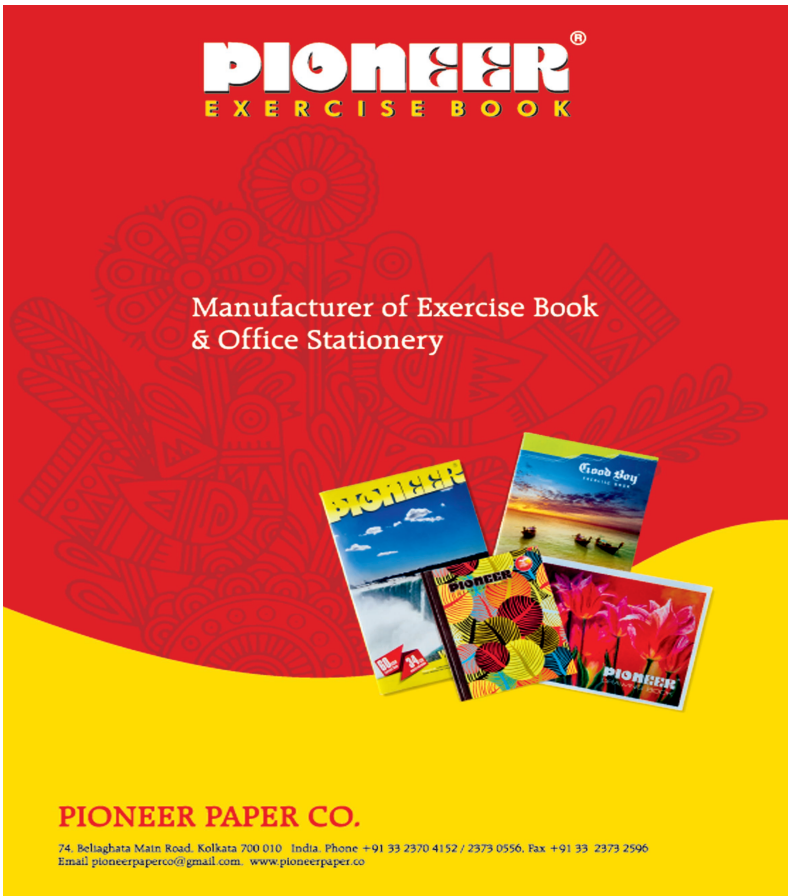

তথ্যসূত্র :

১। আত্মকথা : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

২। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও সমকালীন বঙ্গ সমাজ— নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য।

(২ আগস্ট আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মদিন উপলক্ষে প্রকাশিত)

‘দিব্যপ্রেম সেবা মিশন’

সৌরভ সিংহ॥ মা গঙ্গার কোলে মৃত্যু হলে জীবন-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে— এই আশায় হরিদ্বারের গঙ্গাতটে হাজার হাজার লোক আজও মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বসে থাকেন। এঁদের মধ্যে আবার বেশি সংখ্যায় যাঁরা কুষ্ঠুরোগে আক্রান্ত। তাঁরা পরিবার-পরিজন দ্বারা বিতাড়িত ও অপমানিত। দুরারোগ্য এই রোগের জন্য যাঁরা সব সময় কুণ্ঠিত থাকেন ও সব সময় নিজেদের পাপী বলে মনে করেন। শুধু মাত্র পেট ভরানোর জন্য তাঁরা অর্ধগলিত হাত কিংবা পা নিয়ে একটু ভিক্ষা পাওয়ার আশায় সারাদিন রোদে-জলে বসে থাকেন। সামাজিক বঞ্চনা, রোগের যন্ত্রণা ও নিরাশাময় জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার অর্থাৎ মৃত্যুর প্রতীক্ষায় তাঁরা দিন গোনেন। এসব দেখে কোনো কোনো বিবেকবান ব্যক্তির হৃদয় কেঁদে ওঠে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রাক্তন প্রচারক আশিস গৌতম ১৯৮৬ সালে হরিদ্বারে মা গঙ্গার দর্শনে গিয়েছিলেন। তাঁর চোখে পড়ে হাজার হাজার কুষ্ঠরোগী গলিত হাতে ভিক্ষা চাইছে। এমনিতেই তাঁর সংবেদনশীল মন ছিল, পারিবারিক কারণে প্রচারক জীবনে ইতি টেনে বাড়ি ফিরতে হয়েছে, কিন্তু এখানে কুষ্ঠরোগীর করুণ দুর্দশা দেখে আবার হৃদয় কেঁদে উঠল। এদের যন্ত্রণা দূর করার সঙ্কল্প করে বসলেন। আর সেই মতো কাজও শুরু করলেন। প্রথম প্রথম গঙ্গাতীরে রোগীদের ক্ষতে প্রতিদিন ওষুধ লাগানো, তাদের ঝুপড়িতে গিয়ে ঔষুধ খাওয়ানো, তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করানো ইত্যাদি কাজ শুরু করেন। তাঁর এই

রোগীর শুশ্রূষায় আশিষ গৌতম।

সেবাকাজ দেখে হৃদয়বান কিছু লোক তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। কয়েকজন ডাক্তারবাবুও তাঁর এই কাজে তাঁকে সহযোগিতা করতে শুরু করেন। কুষ্ঠরোগীদের মধ্যেও কয়েকজন প্রাথমিক চিকিৎসা শিখে নেন। এর ফলে কুষ্ঠরোগীর সেবা খুব ভালোভাবে চলতে থাকে। এই সেবাকাজ পরিচালনার জন্য আশিস গৌতম একটি ডিসপেনসারি খোলেন। তাঁর এবং তাঁর সহযোগীদের সেবাকাজ দেখে অনেক সহৃদয় ব্যক্তি অর্থ ও ওষুধ দান করতে শুরু করেন। কয়েক বছরের মধ্যে ছোট্ট ডিসপেনসারি একটি হাসপাতালে পরিণত হয়ে যায়। সবার পরামর্শে তিনি হাসপাতালের নাম রাখেন ‘দিব্যপ্রেম সেবা মিশন’। হাসপাতালে চিকিৎসা ও সেবা পাওয়ার জন্য কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা বাড়তে শুরু করে। স্ত্রী ও পুরুষ দু’রকমই রোগী। স্ত্রী কুষ্ঠরোগী একাই থাকেন কিন্তু পুরুষ রোগীর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী থাকেন। হাসপাতালে দু’জনকেই স্থান দেওয়া হয়। গৌতমজী একটি মর্মস্পর্শী অভিজ্ঞতার কথা জানালেন--- ‘‘যদি কোনো পুরুষের কুষ্ঠরোগ হয়, পরিবার পরিজন তাকে ত্যাগ করে, কিন্তু পতিব্রতা স্ত্রী তার স্বামীকে ছাড়ে না, স্বামীর সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে ভিক্ষা করে। আবার দুর্ভাগ্যবশত যদি কোনো স্ত্রীলোকের এই রোগ হয় তাহলে তার স্বামী তাকে ত্যাগ করে দ্বিতীয় সংসার পাতে। এ মানবতার কলঙ্কস্বরূপ।’’ তিনি আরো জানালেন— ‘‘বিধবা কুষ্ঠরোগীদের অবস্থা আরো মর্মস্পর্শী। তাদের সঙ্গে তাদের ছেলেমেয়ে থাকে। নিজেরাই খেতে পায় না, আর বাচ্চাদের কে খাওয়াবে পরাবে?’’

এতেও দমে যাননি গৌতমজী। মহিলাদের আত্মনির্ভর করার জন্য, যেন ভিক্ষা না করতে হয় তার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ শুরু করেছেন। তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুলও শুরু করেছেন। স্থানীয় যুবকযুবতীরা স্কুলে পড়ানোর জন্য স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছেন। তাঁর বক্তব্য--- ‘‘সমাজে পরিবর্তন ও সংস্কারের জন্য কেবল সরকারই যথেষ্ট নয়। আমরাও সমাজের অঙ্গ। সমাজের দুঃখদুর্দশায় আমাদের এগিয়ে আসা উচিত। আমরা চেষ্টা করেছি। সমাজের সহযোগিতায় গত ২৮ বছর ধরে ‘দিব্যপ্রেম সেবা মিশন’ সমাজেরই সাহায্যে কাজ করে চলেছে। আর এতে সরকারের থেকে কোনো অর্থ সাহায্য নেওয়া হয়নি।’’ বস্তুত দিব্যপ্রেম সেবা মিশন কুষ্ঠরোগীদের একটা ভরসার স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আশিস গৌতমের সহযোগীরা আজ ‘রোগকে ঘৃণা কর, রোগীকে নয়’ শুধু কথার কথা না রেখে তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। গৌতমজী খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন— ‘‘কুষ্ঠরোগ ছোঁয়াচে রোগ নয়, দিব্যপ্রেম সেবা মিশনের কোনো সেবক এই রোগে আক্রান্ত হয়নি।’’

বর্ষাকালে হোমিওপ্যাথি

ডাঃ বিপ্লব স্বর্ণকার

গ্রীষ্মকাল শেষ হয়ে যখন বর্ষাকাল আসে তখন তপ্ত পৃথিবীর বৃক্ষরাজি সতেজ হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে রোগজীবাণুও সক্রিয় হয়ে নানা প্রকার রোগে মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। এই সময় ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, সর্দি-কাশি, টায়ফয়েড, চর্মরোগ, বদহজম ইত্যাদিতে বিশেষত গ্রামের মানুষই বেশি নাজেহাল হয়ে পড়েন।

বর্ষাকালে স্বাস্থ্য-সচেতন ব্যক্তি কতকগুলি বিষয়ে নজর দেবেন :

 ফল, সবজি ব্যবহারের আগে ভালো ভাবে ধুয়ে নিতে হবে।

 বাসি খাবার ও অনেক আগে থেকে কেটে রাখা ফল না খাওয়া।

 এসময় হজমশক্তি কম হয়ে পড়ে, তাই বেশি ভাজাভুজি ও তেল-মশলা ব্যবহার না করা।

 ঠাণ্ডা ও টক জিনিস না খাওয়া।

 শুদ্ধজল বেশি পান করতে হবে।

 মশারি অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে।

 প্রতিবার খাবারের আগে সাবান দিয়ে ভাল করে হাত ধুয়ে নিতে হবে।

 খাবারের বাসনপত্র শুদ্ধ জলে ভাল করে ধুতে হবে।

এর সঙ্গে হোমিওপ্যাথি ওষুধের ব্যবহার বিধি শিখে নিয়ে নামমাত্র খরচে তা ব্যবহার করলে সুস্থ জীবনযাপন করা যাবে।

যে সকল রোগ বর্ষাকালে বৃদ্ধি পায় বা প্রকাশ পায় তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেট্রাম সালফ, রাস টক্সের মতো কিছু ঔষধ বেশ উপকারে আসে। ওষুধ নির্বাচন করার সময় অসুখের কারণ ও ঔষধের লক্ষণ নির্ধারণ করা জরুরি।

নেট্রাম সালফের ক্ষেত্রে—

অসুখের কারণ : বর্ষাকাল, বৃষ্টির জল, জলো হাওয়া, জলাভূমিতে (Damp) বসবাস, দাঁড়ান বা শোয়া, জলীয় খাদ্য বা সে সকল খাদ্যে জলের ভাগ বেশি

যেমন-পান্তাভাত, পালংশাক, পুঁই শাক, মূলা, কলমি, কচুশাক ও বাঁধাকপি প্রভৃতি খেয়ে অসুস্থ হলে উদরাময় বা বদহজমে জ্বর, ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া, হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট, আঙ্গুলহাড়া, দাঁতে ব্যথা, পেটে ব্যথা প্রভৃতিতে নেট্রাম সালফ উপকার দেবে।

লক্ষণ : (১) হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট, জোরে জোরে শ্বাস নেওয়া, বুকের বাম দিকে ব্যথা, বুকে সাঁইসাঁই শব্দ হলে,

(২) বুকে ব্যথা, উঠে বসলে ও দুই হাত দিয়ে বুক চেপে ধরলে কমে,

(৩) ঘন সবুজ বা হলদে-সবুজ কফের মতো পায়খানা,

(৪) জিহ্বা সবুজাভ, ধূসর লেপ, তিক্ত স্বাদ,

(৫) বিষণ্ণ ভাব বা বিরক্ত হওয়া, বন্ধুবান্ধব বা গানবাজনা পছন্দ না করা, আত্মহত্যার ইচ্ছা জাগা,

(৬) উদরাময় (পাতলা পায়খানা)—সকালে যখনই বিছানা ছেড়ে পা মেঝেতে রাখে তখনই পায়খানার বেগ আসা,

(৭) বায়ু নিঃসরণের সময়ে পায়খানা বেরিয়ে আসে,

(৮) পেটে ব্যথা যা প্রথমে নড়া-চড়ায় বাড়ে কিন্তু কিছুক্ষণ নড়া-চড়া বা চলাফেরা করলে কমে,

(৯) অনবরত লম্বা ও ঘন শ্বাস নেওয়া।

রাস টক্সের ক্ষেত্রে :

রোগের কারণ : বৃষ্টির জলে ভেজা, জলাভূমি বা স্যাঁতসেঁতে স্থানে বাস করে অসুস্থ হলে রাসটক্স বেশ কাজে আসে।

উক্ত কারণে জ্বর, মাথাব্যথা, গা ব্যথা, সর্দি-কাশি, বাত, পিঠে ব্যথা যাই হোক না কেন রাসটক্স উপকার দেবেই।

লক্ষণ : (১) জ্বরের সঙ্গে গা ব্যথা থাকবে।

(২) জিহ্বায় দাঁতের ছোপ থাকবে ও জিহ্বার সামনে ত্রিকোণ আকারের লালচে ভাব থাকবে,

(৩) ব্যথা চেপে দিলে আরাম হবে। প্রথম চলাফেরায় বাড়ে কিন্তু অনবরত চলাফেরা করলে তা কমে,

(৪) ব্যথা বাম দিকে বেশি হয় এবং রাত্রে বাড়ে,

(৫) মুখের চার ধারে জ্বরসোটা হয়,

(৬) যে কোনো জ্বর, ছটফটানি অর্থাৎ অস্থিরতা থাকলে রাস টক্স উপকার দেবেই।

উপরোক্ত ওষুধ ভালো হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের পরামর্শ নিয়েই ব্যবহার করা উচিত। ■

জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান

উত্তরবঙ্গ সংস্কৃতভারত্যাঃ ভাষাবোধন বর্গঃ

গত ঊনবিংশতঃ একবিংশ জুলাই পর্যন্তম্ কোচবিহার বিভাগস্য 'ভাষাবোধন বর্গঃ' কোচবিহার নগরস্থিতঃ সারদা শিশুতীর্থে অভবৎ। বর্গে দ্বি-জনপদতঃ চত্বারিংশ জনাঃ আগতবন্তঃ। বর্গে সংস্কৃত ভারত্যাঃ বিবিধাকার্য্যং, কার্য্যপদ্ধতি, কার্য্যকর্তা বিষয়ে চর্চা অভবৎ।

বর্গে বিভাগ সংযোজকঃ শ্যামকুমার ঝা, জিলা সংযোজকঃ বিপ্লব সাহা, শিক্ষকঃ নিখিল বর্মনঃ এবম্ প্রান্ত সংগঠন সম্পাদকঃ সমীরণঃ আসন্।

কৃতী বিদ্যার্থী সংবর্ধনা

গত ২০ জুলাই সন্ধ্যা সাতটায় নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব সভাগারে মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক উত্তীর্ণ দুই শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীকে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (ABVP)-এর নকশালবাড়ি শাখার উদ্যোগে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। প্রত্যেককে একটি পকেট অভিধান (Pocket Dictionary), স্বামীজীর ছোট্ট জীবনীগ্রন্থ ও কলম-সহ নোটবই উপহার দেওয়া হয়। বিদ্যার্থীদের হাতে উপহার তুলে দেন বিদ্যার্থী পরিষদ ও অন্যান্য সংগঠনের কর্মকর্তাবৃন্দ। সভায় প্রধান বক্তা বিশিষ্ট শিক্ষক ও সমাজসেবী মনোরঞ্জন মণ্ডল তাঁর ভাষণে বিদ্যার্থীদের অধ্যয়ন ও দেশমাতৃকার কাজে মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানান। অন্যদের মধ্যে ছিলেন জেলার সংগঠন সম্পাদক (ABVP) অনুপ কুমার ভাদানি, রাজ্য সম্পাদক চন্দন রাউত, শিলিগুড়ির সম্পাদক গণেশ কামতী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যকর্তা বাসুদেব পাল প্রমুখ। নকশালবাড়ি শাখার ব্যবস্থাপনায় (ABVP) এই মনোজ্ঞ সারস্বত অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও রবীন্দ্র গীতিনৃত্য প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অভিজিৎ পাল এবং ধন্যবাদ জানান গৌরব দে।

সমাবেশ সমাচার

সহকার ভারতীর পুরুলিয়া জেলা সম্মেলন

গত ৬ জুলাই পুরুলিয়া জেলার ঝালদা হাইস্কুলে জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। পুরুলিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় তিন শতাধিক মহিলা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সারাদিন ব্যাপী এই সম্মেলনে সভানেত্রী হিসাবে সভা পরিচালনা করেন 'প্রস্তাবিত মমতাময়ী মহিলা ঋণদান সংস্থা'র সম্পাদিকা মমতা মাহাতো। অনুষ্ঠানে সহকার ভারতীর রাজ্য সংগঠন সম্পাদক বিবেকানন্দ পাত্র সহকার ভারতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। ওড়িশা প্রান্তের Self Helf Group প্রমুখ প্রফুল্ল পড়িয়া ডেংকানালে ২৫০০ মহিলা প্রান্তের সংগঠন সম্পাদক লক্ষ্মণ পাত্র ঝাড়খণ্ড প্রান্তের ডালটনগঞ্জের ৪০ হাজার মহিলা স্বনির্ভরতার বিবরণ তুলে ধরেন। রাজ্য সভাপতি ড. তুহিন চক্রবর্তী বাংলায় বিশেষ করে পুরুলিয়া জেলার মহিলাদের ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ় করার আহ্বান জানান। রাজ্য সহ-সভাপতি ডাঃ সুজিত দে এস.এইচ.জি.-এর গঠন, সমস্যা এবং তার সমাধান কীভাবে হবে তার আলোচনা করেন। অংশগ্রহণকারী মহিলাগণ দলের অনেক সমস্যা তুলে ধরেন। যেসব এস.এইচ.জি. ভালো চলছে তারও বিবরণ তুলে ধরেন। এছাড়া পুরুলিয়া জেলার এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, ঝাড়খণ্ড প্রান্তের সংগঠন প্রমুখ শ্যামবিহারী সিং, এস.এইচ.জি. প্রান্ত প্রমুখ স্বপ্না দে, প্রান্ত মহিলা প্রকোষ্ঠ প্রমুখ পলি মল্লিক, তন্তুরায় প্রকোষ্ঠ প্রমুখ সন্তোষ শীল, স্থানীয় পিএসিএস-এর ম্যানেজার কমল প্রামাণিক, জ্যোতির্ময় সিং মাহাত, জগদীশ মাহাত, দুর্গাচরণ মাহাত, পঞ্চানন মাহাত ও অসীমা মাহাত, সুলেখা মাহাত। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পুরুলিয়া জেলা সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ মাহাত।

সংস্কার ভারতীর শিল্পী সম্মাননা দিবস পালন

সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান— সংস্কারভারতী শ্রীগুরুপূর্ণিমা তিথিতে সংস্কৃতির আদিগুরু নটরাজ বন্দনায় ব্রতী হয়েছিল। এই সঙ্গে ওই তিথিকে 'শিল্পী সম্মাননা দিবস' হিসাবে উদযাপন করলো সংস্কার ভারতী সিউড়ি শাখা। এ বছর আলোকশিল্পী বিশ্বনাথ বিশ্বাসকে সম্মাননা জানানো হয়।

শিল্পী সম্মাননা দিবসে সংস্কার ভারতী সিউড়িশাখা এই প্রতিভাবান শিল্পীকে সম্মান জানিয়ে শিল্পীর হাতে সম্মান স্মারক তুলে দেন শাখার সভানেত্রী লোকসম্রাজ্ঞী স্বপ্না চক্রবর্তী। মানপত্র পাঠ করেন স্বরলিপি দাশ। শিল্পীর হাতে মানপত্র, উপহার, ফল, মিষ্টি তুলে দেওয়া হয় সংস্থার পক্ষ থেকে।

ড. শ্যামাপ্রসাদ জন্মদিবস পালন

ভারতীয় জনতা পার্টির বহরমপুর মণ্ডল-২-এ ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১১৪ তম জন্মদিন অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয় রাধারঘাট বসন্ততলায়। অনুষ্ঠানের আকর্ষণ ছিল রক্তদান শিবির।

সকাল ১০টায় পতাকা উত্তোলন ও শ্যামাপ্রসাদের মূর্তিতে মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার সহসভাপতি বিনয় ভূষণ দাস অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন এবং শ্যামাপ্রসাদের কর্মময় জীবনের নানান দিক তুলে ধরেন। এদিনের এই রক্তদান শিবিরে ষাট জন রক্তদান করেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো কুড়িজন মহিলা রক্তদান করেন।

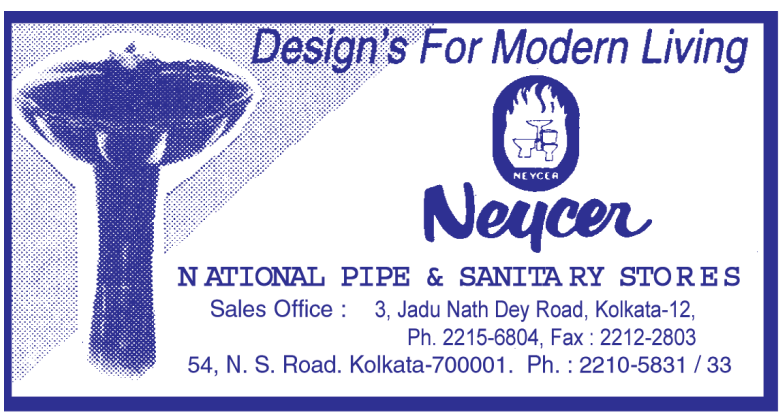

মঙ্গলনিধি

গত ২০ জুলাই নদীয়া জেলার হাসখালি থানার পূর্ব ভায়না গ্রামের স্বয়ংসেবক মিথুন বিশ্বাসের শুভ বিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে তাঁর বাবা গোকুলচন্দ্র বিশ্বাস ও মা নীলিমা বিশ্বাস মঙ্গলনিধি প্রদান করেন সমাজ সেবা ভারতীর প্রাদেশিক সহ-সম্পাদক শিবদাস বিশ্বাসের হাতে। অনুষ্ঠানে সঙ্ঘের জেলা প্রচারক ও জেলা সহ-শারীরিক প্রমুখ যুগল বিশ্বাস-সহ অনেক কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

শোকসংবাদ

প্রবীণ স্বয়ংসেবক, বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী মধুসূদন চক্রবর্তী গত ১৪ জুলাই দমদমের বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র, পুত্রবধূ

ও দুই নাতি-সহ আত্মীয় পরিজন রেখে গেছেন। তাঁর শিল্পকর্ম কন্যাকুমারীর বিবেকানন্দ শিলা স্মারক মন্দিরে বিদ্যমান। আমৃত্যু তিনি সংস্কার ভারতীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

***

মেদিনীপুর নগরের স্বয়ংসেবক ভোলানাথ নন্দীর মাতৃদেবী গত ১৮ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনি রেখে গেছেন।

***

বসিরহাট জেলার হাসনাবাদ মহকুমার বৌদ্ধিক প্রমুখ নিমাই ঘোষের পিতৃদেব গত ৭ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র ও ২ কন্যা রেখে গেছেন।

DAS STEEL UDDYOG

Naldubi, Mangalbari, Po.+Dist. : Malda

সকল প্রকার স্টীল ফার্ণিচার,
গ্রীলগেট এবং ফেব্রিকেশনের
কাজ করা হয়

Show Room

—ঃ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—

GEETANJALI FURNITURE

Jhaljhalia, Station Road, Malda

Phone : 03512-266063,

Mobile : 9733387091

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

"হিন্দুধর্ম কখনও মানুষকে শুধুমাত্র অধ্যয়ন এবং বিশ্বাস করে তৃপ্ত থাকতে বলে না। কোন বিষয়ে কথা বলার অধিকার অর্জন করতে হলে সে বিষয়ে প্রথমে অবশ্যই উপলব্ধি প্রয়োজন। আমাদের ধর্মবিশ্বাস সেজন্য প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি এবং ব্যক্তিগত প্রয়োগের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

বঙ্গম

বাজারি অর্থনীতিতে থিয়েটার এখন পয়সাওয়ালা মানুষের

বিকাশ ভট্টাচার্য

দামি টিকিটের নাটক 'অ্যান্টনি-সৌদামিনী'।

সম্প্রতি বেশ কিছু নাটকের টিকিটের দাম মধ্যবিত্ত বা গরিব-গুর্বো মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। সেদিন পরিচিত এক নাট্যপ্রেমী মানুষকে জিজ্ঞেস করলাম সারারাত ধরে অভিনয় হয় ওই নাটকটা দেখেছেন? তিনি বললেন কি করে দেখবো? টিকিটের দাম ৫০০্। অতটা পকেটের জোর নেই! বাংলা নাটকে যাঁকে উত্তমকুমার বলা হয়, শুধুমাত্র যাঁর অভিনীত নাটক নিয়ে সপ্তাহব্যাপী ৯টি পৃথক পৃথক নাটকের উৎসব হয়— তাঁর অভিনীত যে-কোনও নাটকের টিকিট এখন ২৫০্, ১৫০্, ১০০ টাকা। আবার এইসব নাটক হাউসফুলও হচ্ছে। রাজ্যের মন্ত্রী যখন থিয়েটার করেন তখনও টিকিট পাওয়া যায় না— দাম বেশি হওয়া সত্ত্বেও। আমি নিজে নাটক করি বলে এ ধরনের বেশ কিছু নাটকে আমন্ত্রিত হয়ে দেখেছি। সত্যি বলতে কি নাটক দেখে মন ভরে গেছে— এমন নয়। বেশ কিছু মফস্সলের দল ওর থেকে ভালো গুণমানের নাটক করছে। তারা কলকাতায় এলে ৩০০ বা ৪০০ দর্শকও হয় না। কেন এই বৈপরীত্য— দেখা যাক নাট্যজগতের কর্তাব্যক্তিরা কি বলছেন।

৫২ বছর ধরে নাটক করছেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। সম্প্রতি একটি আলোচনা সভায় তিনি নান্দীকারের নাটক ধরে ধরে বিক্রির হিসেবে টিকিটের মূল নিয়ে বিশ্লেষণ করে সমাজ কত দ্রুত বদলে যাচ্ছে তার উল্লেখ করেন। বাজারি অর্থনীতিতেই থিয়েটার এখন উচ্চবর্গের মানুষের বিনোদনের বিষয় সেটি ধরা পড়ে তাঁর তথ্যে। শেষে একেবারে ক্ষোভে ফেটে পড়েন থিয়েটারকে একটা 'প্রোডাক্ট' হিসেবে যাঁরা দেখেন তাঁদের উদ্দেশ্যে। বাজারি কৌশল করে হয়তো লড়তে হয় কিন্তু থিয়েটারের কেন্দ্রে থাকে একদল জীবন্ত মানুষের টিকে থাকার লড়াই। বাঙালি এখনও হৃদয় ও মস্তিষ্ক দিয়ে নাটক করে। একসময় গ্রুপ থিয়েটারে একটা আদর্শের জায়গা ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় থিয়েটারে লোকশিক্ষা হয়— এটা সবাই অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতো। তাই কোন নাটক সমাজের পক্ষে ভালো আর কোনটা মন্দ, এ নিয়ে গ্রুপের সকলের স্পষ্ট মতামত ছিল। পরিচালকও সকলের মত মানতেন, না হয় নিজের মতটা সকলকে বোঝাতেন। এখন বিভিন্ন গ্রুপের ভালো ভালো অভিনেতা-অভিনেত্রীকে নিয়ে নাটক হয়। গ্রুপের ছেলেরা তাঁদের পাশে অভিনয় করে ধন্য হয়। আগে একটা গ্রুপ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ভালো অভিনেতা-অভিনেত্রী বের হোত, এখন আর তা হয় না। পরিচালকের সে সময়ও নেই। কারণ এখন একজন সফল পরিচালক নিজের গ্রুপ ছাড়াও আরও তিন চারটি গ্রুপে গিয়ে নাট্য পরিচালনা করছেন। অবশ্যই মোটা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। এবং অবশ্যই নিজের পছন্দমত অন্য গ্রুপের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে নাটককে উতরে দিচ্ছেন। এই রকমই একজন পরিচালককে জিজ্ঞেস করেছিলাম দামি টিকিটের প্রসঙ্গে। তিনি বললেন, মাল্টিপ্লেক্সে গিয়ে ৩০০/৪০০ টাকা খরচ করে রদ্দিমার্কা হিন্দী ছবি দেখতে পারলে বেশি দামের টিকিট কেটে নাটক দেখবে না কেন? নাটক কি চিরকাল ডেফিসিটেই চলবে। কথাটা সত্যি। ৫০/৬০ টাকা টিকিট করে হাউস ফুল হলেও আজকের দিনে একদিনের প্রযোজনা ব্যয় ওঠে না।

এক সাক্ষাৎকারে কৌশিক সেনকে এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, টিকিটের দাম যে-ভাবে লাগামছাড়া হচ্ছে তাতে এই থিয়েটারকে আমরা কোনদিকে নিয়ে যাচ্ছি— মানে কাদের আমরা দর্শক হিসেবে চাইছি? তাঁর ব্যাখ্যা— 'অস্বীকার করার উপায় নেই বাংলা থিয়েটারে এখন সার্প দুটো বিভাজন হয়ে গেছে। কিছু নির্দেশক বা গ্রুপকর্তা কখনোই ষাট টাকার বেশি টিকিট করতে দেবেন না। তাঁরা যে-ভাবে গ্রুপের ছেলেমেয়েদের নিয়ে থিয়েটার করে এসেছেন তাতে এটাই স্বাভাবিক। আবার যাঁরা ২৫০/৩০০ টাকার টিকিট করছেন, একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে সেই থিয়েটারগুলো বেশির ভাগই মিডিয়া নির্ভর। মিডিয়া এক একটা নাটক নিয়ে হুইপ তৈরি করছে।' কৌশিকের কথার মধ্যে একটা সত্য আছে। আমরা তো দেখছি একটা নাটকের রিহার্সাল শুরু হতেই কাগজে কাগজে তার সম্বন্ধে লেখালেখি শুরু হয়ে যায়। কাগজও এখন অনেক আর বিনোদনের পাতাও প্রায় রোজ বেরুচ্ছে। ভরাতে হবে তো? টিভিতেও অনেক চ্যানেল। তারা রোজই তাদের পছন্দের লোকেদের ডেকে এনে তাদের নাটকের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। সম্প্রতি একটি চ্যানেলে একটা নাটকের প্রথম অভিনয়ের আগেই নাট্যকার, পরিচালক ও প্রধান অভিনেতাকে নিয়ে অ্যাঙ্কার বসলেন। কথাবার্তায় দেখা গেল পরিচালক বলছেন এ নাটকটা যা লেখা হয়েছে— একেবারে সুপার্ব। অভিনেতা বলছেন এ নাটকে পরিচালক একেবারে চমকে দিয়েছেন। আর নাট্যকার বলছেন আমি যখন চরিত্রটা লিখি তখনও ভাবিনি এই চরিত্রটায় অভিনয়ের এতদিক আছে। ওতো জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয় করেছে এই নাটকে। অর্থাৎ নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার আগেই দর্শকদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হলো— নাটকটা দেখতেই হবে। দরকার হলে তিনশো টাকার টিকিট কেটেই। মনে রাখতে হবে, এইসব নাটক কিন্তু শহর ও শহরতলির এক বিপুল সংখ্যক দর্শক হারাচ্ছে।

শব্দরূপ-৭১৭ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

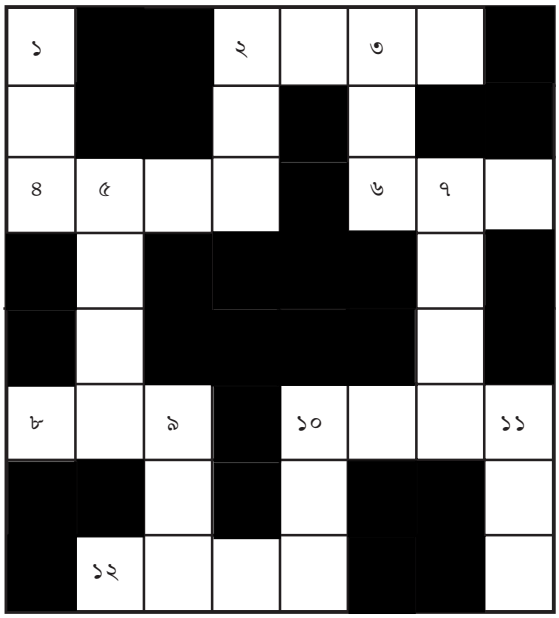

সূত্র :

পাশাপাশি : ২. শ্রীকৃষ্ণের পত্নী, ৪. দাসত্ব করিবার প্রতিশ্রুতিপত্র, ৬. স্ত্রী বাছুর, ৮. শ্রীরাধার স্বামী, ১০. বড় মহাজন যে হুন্ডির কাজ করে, ১২. দশরথপুত্র, রাম।

উপর-নীচ : ১. ভগবতী, দুর্গা, ২. গানের সঙ্গে বাজনার মিল; উপযুক্ত, ৩. শুক্রাচার্য, পরশুরাম, ৫. প্রাকৃতিক; বৈষ্ণবদের সাধনার পদ্ধতি বিশেষ, ৭. কড়ে আঙুল, ৯. রাজা, ১০. রথচালক, ১১. মাঘ মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশী।

সমাধান
শব্দরূপ-৭১৪
সঠিক উত্তরদাতা
সদানন্দ নন্দী
লাভপুর, বীরভূম
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

■	■	নে	য়া	পা	তি	■	গ
আ	কাঁ	ড়া	■	■	তি	■	রু
■	ঠা	■	লো	■	র	গ	ড়
■	লি	ভা	র	■	■	ণ	■
■	ক	■	■	মা	ন্না	দে	■
ব	লা	ই	■	টি	■	ব	■
ড়া	■	লো	■	■	গ	তা	সু
ই	■	রা	জ	রা	জ	■	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

▯ ৭১৭ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৮ আগস্ট, ২০১৪ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা।। বান্দা বৈরাগী।। ৩

SUN-ECO TRADING SYSTEMS PVT. LIMITED.

MINES OWNER / CRUSHER

CHANDIL, JAMSHEDPUR

JHARKHAND

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
4 August - 2014

SURYA

EVERY CITY EVERY HOME

The biggest Indian MultinatiOnal SURYA showcases the best of lighting solutions, unmatched range of fans and quality pipes that touches the live of people from EVERY CITY EVERY HOME

SURYA ROSHNI LIMITED

Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110008 (INDIA)
Tel. : +91-11-25810093-96 Fax : +91-11-25789560
Email : consumercare@sroshni.com Website : www.surya.co.in

দাম : ১০.০০ টাকা